চ

মৃণাল সেন

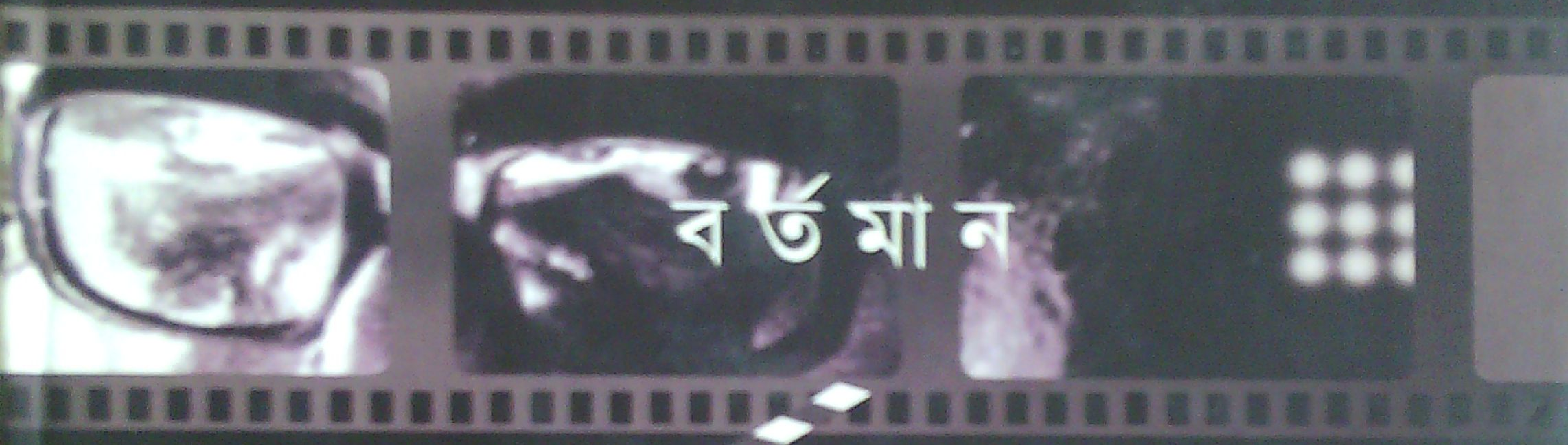

চ্চি

ত্র

পরিচালক মৃণাল সেনের জীবন ও সৃজনের শিল্প ও দর্শনকে চেনাতে সাহায্য করে এ বই। এ বই-এর বিভিন্ন প্রবন্ধে ধরা পড়েছে ছবির দর্শক থেকে সমকালীনতা, ছবি তৈরির কাহিনির পাশাপাশি তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ, চলচ্চিত্র উৎসব-উৎসবের ছবি, জনপ্রিয়তার বিপরীতে চলচ্চিত্রে শৈল্পিক সংকট। আর আছে চার্লি চ্যাপলিনকে নিয়ে গভীর অনুভবী পর্যবেক্ষণ।

সেই সঙ্গে ৪ টি সাক্ষাৎকারে নথিবদ্ধ চলচ্চিত্র সৃজনের অনুপুঙ্খ বিবরণ ও বিশ্লেষণ।

এ-দেশের যে শহরটা, শুনে থাকি, বারুদে ঠাসা—তার নাম কলকাতা। কলকাতায় মিছিল, আওয়াজ, প্রতিবাদ। কলকাতায় বিক্ষোভ, ক্রোধ, ব্যারিকেড আর বোমা। কলকাতা বেপরোয়া, কলকাতা মারমুখী।

আমি কলকাতার মানুষ। আমি কলকাতার মিছিলে শামিল হয়েছি বারবার। মিছিলে আওয়াজ তুলেছি। হাজার লক্ষ গলার সঙ্গে গলা মিলিয়েছি। প্রতিবাদ করেছি। লড়াকু কলকাতার আগুনে আমিও উত্তপ্ত হয়েছি। উনিশশো উনপঞ্চাশের কলকাতার কথা মনে পড়ছে। প্রেসিডেন্সি, আলিপুর আর দমদম সেন্ট্রাল জেল গিজগিজ করছে প্রতিবাদী মানুষের ভিড়ে। বেহিসেবি গুলি আর লাঠি চলছে ভেতরে, বাইরে। এলোপাথাড়ি গুলি, বেপরোয়া লাঠি। আর ওই অসহ্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসছে কলকাতার মানুষ, গ্রামের কৃষক, শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক। এগিয়ে আসছে মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো—সবাই। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আর সন্ত্রাসের সংঘর্ষ। কাকদ্বীপের কৃষক রমণী অহল্যাকে খুন করা হয়েছিল সেই সময়েই। আর সেই সঙ্গে অহল্যার পেটের বাচ্চাটাকেও।

আমার কয়েকজন বন্ধু ও আমি তখন ছবির রাজ্যে ঢোকবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি।

দেশে-বিদেশে ছবি নিয়ে যে প্রচণ্ড তোলপাড় চলছে তার খবর সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছি। কেমন করে এ-দেশের ছবিকেও সংগ্রামের কাজে লাগানো যায় সে কথা ভাবছি। গল্প পড়ছি। নিজেরাও লিখছি, লেখাচ্ছি, বাতিল করছি, বেছে নিচ্ছি এবং তাত্ত্বিক শুদ্ধতা মাথায় রেখে প্রয়োজনমতো মেরামত করে চলেছি। নানা উদ্ভট কল্পনায় সময়ে-অসময়ে তেতে উঠছি মুহুর্মুহু।

একদিন, উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের কথাই বলছি, খবর এল: ইচ্ছে করলে আমরা কাকদ্বীপে যেতে পারি। অর্থাৎ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নানা বাধা ডিঙিয়ে কাকদ্বীপের "লাল" এলাকায় আমাদের পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা

যেতে পারে। আমরা লাফিয়ে উঠলাম, উত্তেজনায় ধৈর্য হারাতে বসলাম, ছুটোছুটি করতে লাগলাম, যেমন তেমন একটা ষোলো মিলিমিটার মুভি ক্যামেরার খোঁজে আকাশ-পাতাল ওলটপালট করে ফেললাম।

ক্যামেরার ব্যবস্থা একটা হল। প্রাচীন এক ক্যামেরা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে, কিন্তু চলে।

চিত্রনাট্য লেখা হল: জমির লড়াই। কাকদ্বীপ ও তেলেঙ্গানার লড়াইয়ের কথা মাথায় রেখে চিত্রনাট্য তৈরি হল, তাত্ত্বিক নেতা-উপনেতাদের সমর্থনও মোটামুটি পাওয়া গেল। সব ঠিক, যাব, ছবি করব, একটা নয়, অনেক।

যাওয়া অবশ্য হল না শেষ পর্যন্ত। অবস্থাটাও কেমন যেন অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল ক্রমশ।

এবং, একদিন, পুলিশের ভয়ে আর কোনও উপায় না থাকায় তাড়াহুড়ো করে চিত্রনাট্যটি পুড়িয়ে ফেলা হল।

তারও কিছুদিন পরে, একদিন, জানলাম, কমিনফর্ম বলেছে আন্দোলন বিচ্যুতির দিকে এগোচ্ছে। শুনে জেনে আশ্বস্ত হলাম, কাকদ্বীপে যেতে না পারার আফশোশটা কিঞ্চিৎ কমল। কিন্তু চিত্রনাট্যটিকে পুড়িয়ে ফেলার যন্ত্রণাটা অবশ্য থেকেই গেল।

আরও দশ বছর পরের ঘটনা। উনিশশো উনষাট সাল। কলকাতা থেকে একশো মাইল দূরে বর্ধমানের অন্তর্গত মানকর গ্রামে ছবি তুলছি। ছবির নাম 'বাইশে শ্রাবণ'। কলাকুশলী কর্মী অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে দলে আমরা সব মিলিয়ে প্রায় চল্লিশজন। মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ গ্রামটি কেমন যেন প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল। গোটা গ্রাম যেন আমাদের ছবির সঙ্গে জড়িয়ে গেল, আমাদের আলাদা থাকতে দিল না। ভুলতে পারা যায় না এমন এক অভিজ্ঞতা।

একদিন খবর পেলাম, কলকাতা নাকি তোলপাড়। কাতারে কাতারে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে কৃষকেরা এসেছে কলকাতায়, মিছিলে শামিল হয়েছে তারা, লালদিঘির পাড়ে উদ্ধত রাইটার্স বিল্ডিং-এর দিকে মিছিল এগিয়ে আসছে। আইন ভাঙতে নয়, আইনের পথেই আসছে তারা, দু' বেলা দু' মুঠো খেতে পাওয়ার দাবি নিয়ে আসছে মিছিল।

মানকরে খবর এল, ওই মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে, অতর্কিতে। শুনলাম, হতাহতের সংখ্যা মোটেই কম নয়। শুনলাম, কলকাতায় নরক জেগেছে।

আমরা শুটিং-এর জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, খবরটা তখনই এল। আমরা, ছবির কর্মীরা, সমস্ত শুনলাম। গ্রামের লোকেরা সমস্ত শুনল। কলকাতা থেকে পরের ট্রেন কখন আসবে, ট্রেনযাত্রীদের কাছ থেকে কখন আমরা কলকাতার আরও

খবর পাব তাই জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম।

সে দিন আমরা শুটিং করিনি। কাজ বন্ধ রেখে সে দিন আমরা সেই অমানুষিক উন্মত্ততার প্রতিবাদ জানালাম।

পরের দিন 'বাইশে শ্রাবণ'-এর যে দৃশ্য আমরা তুললাম তা হল তেতাল্লিশের মন্বন্তরের এক ভয়াবহ ছবি। কেমন করে মানুষেরই তৈরি মন্বন্তরে পিঁপড়ের মতো দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর চোখের সামনে তিল তিল করে মরে গেল সেই কথাই সে দিন আমরা বললাম আমাদের ছবিতে। সেই নারকীয় মারণ যজ্ঞের ভয়ংকর চাপে ব্যক্তি-মানুষ কেমন করে তার শেষ মানবিক অনুভূতিটুকুও হারিয়ে ফেলেছিল তাই আমরা আমাদের বুকের সমস্ত উত্তাপ আর ঘৃণা দিয়ে ছবিতে হাজির করলাম।

আরও দশ বছর পরে। উনিশশো উনসত্তর সাল। একটা রসঘন মিষ্টি ছবি তৈরি করেছি তখন 'ভুবন সোম'। ছবিটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল, ওপরতলা নিচুতলা সমাজের সর্বস্তরেই ছবিটির কথা ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই, বহু দর্শক, সাধুবাদ জানালেন।

অসতর্ক মানুষ যাঁরা তাঁরা সে দিন তেমন বুঝতে পারেননি, আমিও বুঝিনি যে কলকাতার আকাশে আবার মেঘ জমছে, ঝড় আসছে।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই, সত্তর সালে, ঝড় এল। অনেক কিছুই ওলটপালট হয়ে গেল। সাময়িকভাবে, অল্প সময়ের জন্য, সাধারণ মানুষ কেমন যেন হকচকিয়ে গেল খানিকটা।

কিন্তু পরক্ষণেই প্রতিবাদ উঠল কলকাতার আনাচে-কানাচে। প্রতিরোধ মাথা তুলে দাঁড়াল।

প্রথমে ছিটিয়ে ছড়িয়ে, তারপর একসঙ্গে কলকাতা আবার খেপে উঠল প্রচণ্ড বিক্রমে। কলকাতা ফেটে পড়ল প্রতিটি মহল্লায়, অলিতে-গলিতে, শহরের গোপন আস্তানায়। একদিকে ব্যারিকেড বোমা আর পাইপ গান, অন্যদিকে সন্ত্রাস আর সি-আর-পি-র কুম্বিং অপারেশন।

কলকাতার রাস্তায় তখন রক্ত ঝরছে। আর পার্ক স্ট্রিট—চৌরঙ্গির মোড়ে মহাত্মা গান্ধির স্ট্যাচুটাকে ঘিরে থাকছে বন্দুকধারী সেপাইয়ের দল।

শাসকের হাতে অবশ্যই জাদুদণ্ড নেই যে তাই ঘুরিয়ে রাতারাতি দেশের মানুষের মুশকিল আসান করবে। তাই অনাহারে মানুষ তখনও মরেই চলেছে, জিনিসপত্তরের দাম চড়ছে হু হু করে, গ্রামে-গঞ্জে জোতদারের অত্যাচার অব্যাহত, গরিবেরা নিঃস্ব হচ্ছে, অর্থবানেরা আরও ফাঁপছে।

অর্থাৎ, এস ওয়াজেদ আলির সেই পুরোনো কথা: সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে...।

উনপঞ্চাশ সালের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল তাদের কথা যারা "বিচ্যুতি" নিয়েও লড়েছিল কাকদ্বীপে, তেলেঙ্গানায়। মনে পড়ল আমাদেরই বন্ধু সলিল চৌধুরির সেই বিখ্যাত কবিতার কথা, 'শপথ', যে কবিতাটি উৎসর্গ করা হয়েছিল কৃষক রমণী অহল্যার উদ্দেশে। মন্ত্রের মতো আওড়াতে ইচ্ছে করল কবিতাটির সেই কয়েকটা কথা:

সে দিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে
হরতাল হয়েছিল।
সে দিন আকাশে জলভরা মেঘ
বৃষ্টির বেদনাকে
বুকে চেপে ধরে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল।
এই পৃথিবীর আলো বাতাসের
অধিকার পেয়ে পায়নি যে শিশু
জন্মের ছাড়পত্র
তারই দাবি নিয়ে সারা কাকদ্বীপে
কোনও গাছে কোনও কুঁড়িরা ফোটেনি
কোনও অঙ্কুর মাথাও তোলেনি
প্রজাপতি যত আর একদিন
গুটিপোকা হয়েছিল
সে দিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে
হরতাল হয়েছিল।

হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে সলিল সে দিন হরতালের ছবি এঁকেছিল, পশুশক্তির বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিবাদের ভাষা সে দিন মুখর হয়ে উঠেছিল সলিলের অস্তিত্বের প্রতিটি শিরা-উপশিরায়, কলমের ডগায়। সেই ভাষাকে সলিল দেখেছিল প্রচণ্ড বিক্ষোভে ছড়িয়ে পড়তে দেশের চতুর্দিকে—কারখানায়, খামারে, কলকাতার রাস্তায়। সলিলকে সে দিন আমরা বুকে করে নিয়েছিলাম।

লক্ষ মানুষের হয়ে সলিল সে দিন শপথ নিয়েছিল:

গ্রাম নগর
মাঠ পাহাড়
বন্দরে
তৈরি হও।

কার ঘরে
জ্বলেনি দ্বীপ
চির আঁধার
তৈরি হও।
কার বাছার
জোটেনি দুধ
শুকনো মুখ
তৈরি হও।
ঘরে ঘরে
ডাক পাঠাই
তৈরি হও
জোট বাঁধো।

উনিশশো সত্তরের সেই ভয়ংকর দিনে আরও অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা, দেশজ 'ম্যাও'-এর কবি সুভাষ নয়, আনন্দবাজারের চিঠিপত্র বিভাগের পত্রলেখক ঠুনকো অনুযোগকারী সুভাষ নয়, পদাতিক-এর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ল। যে কথা আমাদের সকলের মুখে মুখে সে দিন ফিরেছিল সেই কথা:

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য।

কথাটা পুরোনো, চল্লিশ দশকের শুরুর কথা। কিন্তু, মনে হল, যেন আজকের কথা, আজকের বিধান। মনে হল, ভেতর থেকে একটা বিশাল তাগিদ এল, একটা চাপ, এক ইস্পাতকঠিন নির্দেশ: ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য।

'ভুবন সোম' নয়। আসুক অন্য কিছু। সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরই ভাষায় 'চলমান হাত' নিশপিশ করতে লাগল।

উনিশশো উনপঞ্চাশের 'জমির লড়াই' সম্ভব নয় এ-দেশের ছবিতে। নানা বাধা, ব্যবহারিক এবং আরও অনেক। যা সম্ভব—হয়তো তা আংশিক স্পষ্ট, বাকিটা ধোঁয়াটে কিংবা কল্পলোকের, স্বপ্নরাজ্যের, খানিকটা বিমূর্ত, ইচ্ছাপূরণের বা—হোক না তাই। দর্শক যেখানে আজকেরই মানুষ তাঁর কাছে সেই ধোঁয়াটে বিমূর্ত ছবিটাই কি রক্ত-মাংস নিয়ে এগিয়ে আসবে না? সমস্ত শারীরিকতা নিয়ে দর্শকমানসে তা কি ধরা দেবে না?

হয়তো কারও কাছে ধরা দেবে, কারও কাছে নয়। যাঁরা অর্থ খুঁজে পাবেন না এবং / অথবা যাঁরা আপাত অর্থহীন ছবিগুলোকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চৈতন্য' দিয়ে দেখতে নারাজ তাঁদের সংখ্যা হয়তো ভয়ংকর হয়ে দাঁড়াবে। তবু...।

উনিশশো উনসত্তরের দশ বছর পরে আসবে উনিশশো উনআশি। সেই সময়টা আসতে আরও কয়েক বছর বাকি। এই কয়েক বছরে সমাজজীবনে শিবিরে শিবিরে বিরুদ্ধতা আরও বাড়বে, আরও শানিত হবে, মধ্যবর্তীরা ধীরে ধীরে ইতিহাসের নিয়মে বিলুপ্তির পথে এগোবে, শিবিরে শিবিরে আঘাত-প্রত্যাঘাত তীক্ষ্ণতর হবে। তখন শত্রুকে চেনা যাবে আরও অনেক সহজে, বন্ধুকে পাওয়া যাবে হাতের নাগালের মধ্যে। শত্রু-মিত্রের ভাগাভাগিটা তখন আরও পরিষ্কার হবে কেননা মধ্যবর্তীদের ক্লীবত্ব-প্রাপ্তি তখন আরও পরিপূর্ণ চেহারা নিতে বাধ্য হবে।

এবং এই কথাটাই ইতিহাসের এক ভয়ংকর সময়ে, উনিশশো আটত্রিশ সালে, অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় চ্যাপলিন বলেছিলেন Modern Times ছবিটি তৈরি করবার কিছুদিন পরেই। চ্যাপলিন বলেছিলেন : এতদিন আমার 'চার্লি'কে পৃথিবীর সবাই ভালোবেসে এসেছেন। কিন্তু সময়ের দৌরাত্ম্যে 'চ্যার্লি'-র চরিত্রে এখন বিবর্তন ঘটবে, বড়ো রকমের বিবর্তন। বুঝতে পারছি সবাই আর ওকে আগের মতো ভালোবাসবেন না। ...এবং এই ভাগাভাগির জন্য আমি নিজেকে প্রস্তুত রাখছি।

উনিশশো উনআশিতে আরও স্পষ্টতর ভাগাভাগির জন্য আমাদের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সদর স্ট্রিটের বারান্দা থেকেই যে "চৈতন্য" দিয়ে দেখতে হবে এমন বিধান রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই দেননি।

চলচ্চিত্রে সমকালীনতা

চলচ্চিত্রে সমকালীনতা বা Contemporaneity নির্ধারিত হবে কীভাবে? টাটকা কোনও অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা নিয়ে ছবি তুললেই কি তাকে সমকালীন বলা হবে? না, ব্যবহার্য উপাদানের প্রতি চিত্র-নির্মাতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সমকালীনতা নির্ণীত হবে?

চলচ্চিত্রানুরাগীদের অনেকেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করে ফেলেন অতি সহজেই ট্রাম-বাস-হাল মডেলের মোটরগাড়ি ও মাথার ওপর বিদ্যুৎ-চালিত পাখা থাকলেই তা একালের, আর পাইক বরকন্দাজ লাঠিয়াল ও মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠন ঝুললেই তা সেকেলে। মোটামুটি এই সাদাসিধে ধারণা নিয়েই অনেকে একাল আর সেকালের তফাতটা বুঝে নেন। কিন্তু বিষয়টা অত সহজ না।

একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হবে না এমন একটা ঘটনা এখানে তুলে ধরা যাক:

অ্যান্ড্রোক্লিস ও সিংহের গল্প আজকের নয়, অজানাও নয়। গল্পটি প্রাচীন ও অতিপরিচিত। সেই গল্প নিয়ে বার্নার্ড শ একটা নাটক লিখলেন, নাম 'Androcles and the Lion'. নাটকটি যখন জার্মানির কোথাও মঞ্চস্থ হয়—খুব সম্ভবত বার্লিনেই—তখন এক ডাকসাইটে রাজপুরুষ অভিনয় দেখতে দেখতে এতই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যে নাটক শেষ হওয়ার আগেই একসময়ে তিনি হল থেকে বেরিয়ে যান। শ শুনে আশ্বস্ত হয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'যাক, ভদ্রলোক তাহলে আমাকে বুঝতে পেরেছেন!' সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তিনি জানিয়ে দিতে ভোলেননি যে, যে-দেশটিকে সামনে রেখে তিনি ওই নাটকটি লিখেছিলেন সেই দেশ ইংলিশ চ্যানেলের ও পারে অবস্থিত নয়, পারেই।

ঘটনাটি মজার এবং আমার এই আলোচনায় অবশ্যই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সিংহের পা থেকে কাঁটা তুলে দেওয়ার সেই প্রাচীন গল্প। এবং সিংহটি অকৃতজ্ঞ নয় বলেই পরে এক নাটকীয় মুহূর্তে যখনই সে অ্যান্ড্রোক্লিসকে চিনতে পারল তখন আর তার ওপর হামলে পড়ল না, কাছে এল, কৃতজ্ঞতা জানাল,

ল্যাজ নাড়াল, গা চেটে দিল। কিন্তু তাই দেখে এ-যুগের এক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন রাজপুরুষ খেপে উঠবেন কেন? এবং খেপে গিয়ে সমস্ত শালীনতা বিসর্জন দিয়ে বেরিয়েই বা আসবেন কেন?

নিশ্চয়ই ভদ্রলোক খেপেছিলেন inquisition-এর দৃশ্যে যেখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে বিচারের প্রহসনের মধ্য দিয়ে শাসক তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে যে-কোনও বিরুদ্ধ নীতি, বিরুদ্ধ মত অথবা যে-কোনও নতুন বিশ্বাসকে নস্যাৎ করে দিতে বদ্ধপরিকর। এই হল নাটকের কেন্দ্রবিন্দু, শাসকের নোংরা অস্বাস্থ্যকর এই চেহারাটা তুলে ধরাই হল নাট্যকারের উদ্দেশ্য। এবং এখানে এসেই গোটা কাহিনিটি একটা তাৎপর্য পেল। সঙ্গে সঙ্গে শাসক-প্রতিনিধি নিজেকে দেখতে পেলেন, শাসনযন্ত্রের কদর্য রূপটি তাঁর চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে উঠল, রঙ্গমঞ্চে এতগুলো লোকের সামনে তা তাঁকে বিদ্রুপ করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত ভয়ে রাগে ও লজ্জায় ভদ্রলোক পালিয়ে বাঁচলেন ও এ-যুগের নাট্যকার শ আশ্বস্ত হলেন। যাঁরা রাজপুরুষটির সঙ্গে বেরিয়ে এলেন না, শেষ পর্যন্ত নাটকটি উপভোগ করলেন, তাঁরা নিজেদের এবং চারপাশের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেই প্রাচীন গল্প আর আজকের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিতরে কোথাও একটা যোগসূত্র খুঁজে পেলেন।

এই যোগসূত্রকেই ঔপন্যাসিক হাওয়ার্ড ফাস্ট-ও তাঁর শিল্পকর্মে বারবার তুলে ধরেছেন। এবং এই সত্যটিকেই তিনি বলেছেন 'ancient consistency of mankind'. যিশু খ্রিস্টের জন্মের চারশো বছর আগেকার বিদ্রোহী ক্রীতদাস স্পার্টাকাস-কে নিয়ে ফাস্ট উপন্যাস লিখলেন, পুরোনো ঘটনাকে নতুন করে বললেন, ইতিহাসের এতটুকু বিকৃতি না ঘটিয়ে একালের শ্রেণিসংগ্রামী মানসিকতা দিয়ে প্রাচীনকালের সেই সংগ্রামকে ও সংগ্রামী চরিত্রকে বিশ্লেষণ করলেন এবং শিল্পসম্মত ঢঙে রূপ দিলেন।

এবং একইভাবে খ্রিস্টের জন্মের দেড়শো বছর আগে তদানীন্তন গ্রিক-সিরীয় শাসনের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় ইহুদি কৃষিজীবীর লড়াই ও মুক্তির অলিখিত ইতিহাসকে ফাস্ট একালীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করলেন 'My Glorious Brothers' উপন্যাসে।

শ তাঁর নাটকের ধর্মীয় বিরোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন গল্পকে বিচার করলেন এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। থিয়োলজি নিয়ে মাথা ঘামাননি তিনি, সিংহের কৃতজ্ঞতাবোধ নিয়ে পাতাও ভরাননি। তিনি প্রাচীন ও অতি প্রচলিত একটি গল্পকে অবিকৃত রেখেই সেই উপাদানের মধ্য দিয়ে আধুনিক শাসনব্যবস্থার কুৎসিত রূপটিকে তুলে ধরলেন। ফলে, নাটকে আজকের কথা বিধৃত হল এবং একালের দর্শক নাটকের মধ্যে একালের পৃথিবীকে আবিষ্কার করলেন।

ফাস্টের উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হল। প্রাচীন ইতিহাস অক্ষত রইল, কিন্তু যে-উপাদান দিয়ে সেই ইতিহাস তৈরি হয়েছিল, উপন্যাসে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করা হল শিল্পীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, শিল্পী 'ancient consistency of mankind' আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন এবং পাঠক দেখলেন এ যেন আজকেরই সংগ্রামের কাহিনি—ব্যক্তির ও সমষ্টির।

কিন্তু চলচ্চিত্রে যে Spartacus-টিকে দেখতে পাওয়া যায়, শিল্পীর সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে নেহাতই জাঁকজমকে ভরা সে-যুগের একটি অতি সীমাবদ্ধ গল্প—শুধুই গল্প, যার অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই, ইতিহাসের অনিবার্যতার কোনও লক্ষণ নেই, যার সবটাই স্থূল শারীরিকতায় উপস্থাপিত। যাতে আত্মার আমেজ নেই এতটুকু এবং অধুনা এ-দেশীয় সাহিত্যে তথাকথিত ইতিহাস-আশ্রয়ী গল্পে উপন্যাসে নাটকে যার দৃষ্টান্ত অজস্র। অথচ চিত্র-নির্মাতার যদি ইতিহাসের সেই বোধ থাকত, যদি সেই দৃষ্টিভঙ্গি থাকত তাহলে আজকের দর্শক হয়তো প্রত্যক্ষ করতেন নিজের অভিজ্ঞতাকে এবং চারপাশের চেনা জগৎটাকে।

তাই বলব, পুরোনো বা টাটকা ঘটনা বলে নয়—যে-কোনও ঘটনা, যে-কোনও গল্প, যা কিছু আজকের মানুষকে আজকের কথা মনে করিয়ে দিতে পারবে, আজকের কথা ভাবিয়ে তুলবে, আজকের বস্তুজগতের সঙ্গে একটা যোগসূত্র খুঁজে বার করতে সাহায্য করবে, তাই সমকালীন বলে নির্ণীত হবে। শুধুমাত্র আজকের ব্যবহারিক জীবনের উপাদান দিয়ে তৈরি কাহিনিই নয়, যে কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা, পৌরাণিক ধর্মীয় বা অধর্মীয় আখ্যান অথবা উপকথা রূপকথা সব কিছুই তাদের প্রাচীনত্ব ঘুচিয়ে সমকালীন শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পারে, যদি অবশ্য বর্তমানের সমস্যা সংকট সংঘাতের সঙ্গে সেই যুগের আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এবং যদি, সর্বোপরি, সেই কাহিনি একালের মনস্তত্ত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কৃত্তিবাস অনূদিত রামায়ণ নিশ্চয়ই বড়ো রকমের একটি শিল্পকর্ম, কিন্তু রাম-রাবণের চরিত্রকে মাইকেল মধুসূদন যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন, যে-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করলেন, সেই ভাব বা দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক চিন্তার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তাই শিল্পের বিচারে মেঘনাদবধ কাব্যের সমকালীনতার দাবি অনস্বীকার্য।

পক্ষান্তরে চলচ্চিত্রে এমন প্রায়ই দেখা যায় (এবং অধুনা জনপ্রিয় সাহিত্যেও এর নজির অপ্রচুর নয়) যেখানে আধুনিক জীবনযাত্রার সমস্ত উপকরণই বর্তমান—ট্রাম-বাস, চা-খানা, বড়োলোকের বাড়ির লাউঞ্জ, নিম্নবিত্তের অপ্রশস্ত ঘর, গরিবের বস্তি, সবই—অথচ সমস্ত থেকেও গোটা ব্যাপারটা যেখানে কেমন যেন সেকেলেই থেকে যায়। দৃশ্যবস্তুতে যেখানে আধুনিকতার এক ব্যর্থ ও স্থূল অনুকরণ ছড়িয়ে

থাকে সর্বত্র—সমস্তটাই ভাসা ভাসা, ওপর ওপর অথচ ভিতরে ঘটনায় ও চরিত্রের আচরণে ব্যবহারে, চরিত্র ও ঘটনার মূল্যায়নে একালের চেহারা অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে, যেহেতু কাহিনির চরিত্রগুলো আধুনিক সাজসজ্জায় ঘুরছে-ফিরছে, ট্রামে-বাসে বা গাড়িতে চাপছে এবং ডানলোপিলোর গদিতে অথবা সস্তা হ্যান্ডলুমের চাদর পেতে ঘুমুচ্ছে, এমনকি রেশনের দোকানে লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছে ওরা অথবা রাস্তায় মিছিলে শামিল হয়ে স্লোগান তুলছে, আর তাই কাহিনিটি সমকালীন হয়ে উঠবে এ কথা ভাবার অথবা এ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়ার কোনও কারণ নেই। কাহিনিতে এবং কাহিনির চরিত্রগুলোর মধ্যে একালের হাওয়া বইয়ে দিতে হবে, একালের মনস্তত্ত্বে ব্যাখ্যা করতে হবে সবকিছু, বিশ্লেষণ করতে হবে একালের ঢঙে—তবেই তা একালের কাহিনি হয়ে উঠবে। অর্থাৎ সমকালীনতা নির্ণীত হবে ব্যবহার্য উপাদান থেকে নয়—কীভাবে সেই উপাদানকে ব্যবহার করা হচ্ছে, কী ঢঙে তার বিশ্লেষণ হচ্ছে তার ওপর। কোনও কাহিনিতে আড়াই হাজার বছর আগেকার ঈশপ-বর্ণিত ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাকের ছায়া রয়েছে অতএব কাহিনির প্রাচীনত্ব ঘুচল না এ কথা মনে করার যেমন কোনও যুক্তি নেই, ঠিক তেমনি ভুল করে বসবেন যদি কেউ আধুনিক জীবনযাত্রার উপকরণে ঠাসা কাহিনিমাত্রকেই সমকালীন জ্ঞান করেন।

মূল্য নিরূপণে এ-ধরনের ভুল চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে একটু বেশিরকমই হয়ে থাকে। তার কারণ, চলমান ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্রের মারফত যতখানি স্পষ্ট ও ঘনিষ্ঠভাবে চলচ্চিত্রে বাস্তবের শারীরিক উপস্থাপন সম্ভব, এমন আর কোনও শিল্পমাধ্যমেই সম্ভব নয়। এবং বাস্তবের শারীরিক উপস্থিতি চলচ্চিত্রে সহজলভ্য বলেই দর্শকের মন পেতে চিত্রনির্মাতার বিশেষ বেগ পেতে হয় না। নির্জন দুপুরে দূরে গলির মোড় থেকে যখন আইসক্রিমওয়ালার হাঁক শোনা যাবে—ম্যাগনোলিয়া! —প্রেক্ষাগৃহে বসে দর্শক তখন বিনা দ্বিধায় নিজেকে ভিড়িয়ে দিতে চাইবেন সেই সৃষ্ট পরিবেশের মধ্যে। অথবা, ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই কর্পোরেশনের লোকেরা যখন রাস্তা ধুইয়ে দেবে ও সেই ভেজা রাস্তায় সাইকেলে চেপে কাগজওয়ালা কাগজগুলোকে পাকিয়ে পাকিয়ে ছুড়ে মারবে এ-বাড়ির দোতলায়, ও-বাড়ির দেড়তলায়, গ্যারেজ ঘরের ওপরে আর ঝি বা চাকর কাগজ কুড়িয়ে এনে দেবে বাড়ির কর্তাকে, এবং সঙ্গে ধোঁয়া উঠছে এমনি গরম চা, দর্শক অবশ্যই তখন অসম্ভব মজা পাবেন, এবং দর্শকের মধ্যে যাঁরা কম বেশি অসতর্ক তাঁরা হয় তো আগ বাড়িয়েই গল্প সম্পর্কে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটু বাড়তি রকমের পক্ষপাতিত্ব করে বসবেন। উলটোটাও ঘটছে হামেশাই। ঘটছে বলেই আজ থেকে ন' বছর আগে 'অপরাজিত'-র মতো এক [illegible] আধুনিক ছবি তৈরি করা সত্ত্বেও কোনও কোনও দায়িত্বশীল মহল

থেকে বলা হয়ে থাকে, সত্যজিৎ রায় নাকি সমকালীন জীবনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেননি। অপরাজিত-তে যে-গ্রাম আমরা দেখেছি তাতে দূরে আকাশের গায়ে ডি-ভি-সি-র হাই টেনশন তার অনুপস্থিত সন্দেহ নেই, 'অপরাজিত'-র কলকাতায় নিয়ন সাইনের একটা বিজ্ঞাপনও দেখা যায়নি, রাস্তায় ট্র্যাফিকের অটোমেটিক লাল হলুদ সবুজ আলো তাও দেখিনি। দেখিনি, কেননা কাহিনির কাল গত মহাযুদ্ধেরও বেশ কয়েক বছর আগে। কিন্তু দেখছি সদ্য কৈশোর পেরোনো একটি ছেলেকে যে তার ছোট্ট সংসারের সীমানা ডিঙিয়ে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়িয়েছে বৃহত্তর এক জগতের মুখোমুখি—অচেনা ও বিশাল—প্রতি পদক্ষেপেই যেখানে ভয়, বিস্ময়, ভালোলাগা—প্রতিটি সম্পর্ক গড়ে উঠতেই যেখানে জটিলতা। দেখেছি মা ও ছেলের সম্পর্কের সূক্ষ্ম, স্পষ্ট ও বিচিত্র বিশ্লেষণ, যেখানে তীব্র হয়ে ফুটে উঠেছে একমাত্র ছেলের উচ্চশিক্ষার অদম্য আগ্রহের প্রতি মার মনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। এবং সমস্ত মিলিয়ে বর্তমান যুগের মননশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে যখন 'অপরাজিত'-কে দেখি তখন উঁচু গলায় স্বীকার করি—এ-দেশে এ-যাবৎ যত ছবি তৈরি হয়েছে, এইটিই তাদের মধ্যে আধুনিকতম।

চলচ্চিত্রে সমকালীনতার বিচারে এহেন টালমাটাল দশার মূলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রয়েছে সরলীকরণের প্রতি এক অতি অস্বস্তিকর ঝোঁক। যথার্থ মূল্য নির্ধারণের জন্যে যা প্রয়োজন তা হল বাস্তবের স্থূল শারীরিকতায় আকৃষ্ট না হয়ে আরও গভীরে প্রবেশ করা, আধুনিকতা সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়া, আরও সতর্ক হয়ে ছবি দেখা।

আরও একটি কথা:

সমকালীন চলচ্চিত্রের আসরে পৃথিবী জুড়ে নব্য রীতির চলচ্চিত্রকারেরা আজ যে-বস্তুটি নিয়ে মেতেছেন তা হল ব্যক্তিজীবনে একালের অস্থিরতা, আধুনিক মানসের অব্যবস্থচিত্ততা ও তার আত্মিক সংকট—যার চলচ্চিত্রায়ণ ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্রের নতুন নতুন যান্ত্রিক উদ্ভাবন এবং সেগুলোর সুষ্ঠু ও শিল্পসম্মত প্রয়োগের ফলে নিদারুণ সত্য, স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে উঠছে। চলচ্চিত্রায়ণের সাবেকি নিয়মগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে নব্য চিত্রকারেরা নতুন ঢঙে নতুন সাজে পরিবেশন করছেন তাঁদের বক্তব্যকে—অবশ্যই নতুন ফ্যাশন আমদানি করতে নয়, বক্তব্য প্রকাশেরই ঐকান্তিক তাগিদে।

মানুষের সমস্যা বাড়ছে, মনোজগতের সংকট বাড়ছে। মনস্তত্ত্ব জটিলতর হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের উদ্ভাবনী ক্ষমতাও বাড়ছে দিন দিন।

সমকালীন চলচ্চিত্রের দরবারে চলচ্চিত্রের এই আঙ্গিকগত উদ্ভাবনের ওজনটাও বড়ো কম নয়।

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব ১৯৬৯

'ভেনিস চলচ্চিত্র' উৎসবের আন্তর্জাতিক মর্যাদা সম্প্রতি ক্ষীয়মাণ এমন ধরনের একটা বক্তব্য নানা মহল থেকে শোনা যাচ্ছে। এব্যারই প্রথম আমি এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছি। এ বছরের অন্যান্য চলচ্চিত্র উৎসবগুলোর সঙ্গেও আমার কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। ফলে, মর্যাদার বিতর্কে আমার কোনও মন্তব্য নেই। বরাবরের মতো এবার কিন্তু ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবটি—প্রতিযোগিতামূলক ছিল না! তাই নাকি উৎসব এবার তেমন জমজমাট হয়নি। হতে পারে, নাও হতে পারে। তবে একটা কথা নিঃসংশয়েই বলা যায়: খুব একটা উচ্ছ্বসিত বোধ করার মতো বিশিষ্ট ছবি দেখতে পাইনি উৎসবে, এমন কোনও শিল্পকর্মের সাক্ষাৎ মেলেনি যা অস্তিত্বের মর্মমূলে গভীর নাড়া দিতে পারে।

তবু, এ উৎসবের অভিজ্ঞতার মূল্য আমার কাছে একটুও কম নয়। ছবি কতখানি ভালো লাগল না সেটাও বড়ো কথা নয়। নানা দেশের নানা ধরনের ছবি দেখেছি, নানা পরীক্ষানিরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছি, প্রত্যক্ষ করেছি প্রত্যয় ও প্রকরণের বহুমুখী স্রোত। সর্বোপরি, আসর জমিয়েছি নানা দেশের নানা ভাষাভাষী পরিচালক, সমালোচক, সাংবাদিক, দর্শক, শিল্পীর সঙ্গে, পরিচিত হয়েছি নানা ধরনের চিন্তা ও মনোভঙ্গির সঙ্গে, আমার ভাবনাবৃত্ত ছুঁয়ে গেছে নানা চিন্তাস্রোতের ঢেউ, গ্রহণ-বর্জনে বাধ্যকতা নেই, আছে বিচিত্র প্রবাহতরঙ্গের স্বাদ এবং এক বিচিত্রতম অভিজ্ঞতা। বলা বাহুল্য, চলচ্চিত্র শিল্পের কর্মী হিসেবে এ উৎসবে যোগ দিয়ে আমি উপকৃত হয়েছি, এ সমস্তই আমার কাছে মস্ত একটা অভিজ্ঞতা।

উৎসবে বেশির ভাগ ছবিই পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ থেকে এসেছে। এ ছাড়া পূর্ব ইউরোপের চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরি, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন ইত্যাদি দেশ থেকেও ছবি এসেছে। আর এসেছে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের ছবি—কিউবা, বলিভিয়া ইত্যাদি। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডা থেকেও ছবি এসেছে। আফ্রিকার জন্য আলাদা একটা

বিভাগ তৈরি হয়েছিল, ওই দেশের লোকেরাই সেসব ছবির নির্মাতা। সত্যকথাই, আফ্রিকান ছবির মান উন্নত নয়, কিন্তু খালে খোলে মেশানো জীবনের একটা আস্বাদ মেলে, পাওয়া যায় এক ধরনের আন্তরিকতার আমেজ, কাঁচা জীবনের সৌরভ।

উৎসবে প্রদর্শিত বিভিন্ন দেশের ছবিগুলোর মধ্যে নানা ধরনের বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়বস্তুই সব থেকে বেশি লক্ষ্যগোচর। রাজনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণকে চলচ্চিত্রের উপজীব্য করা হয়েছে অনেক ছবিতেই। কিছু কিছু ছবিতে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবেই রাজনৈতিক মত প্রকাশ করা হয়েছে এবং সেসব ছবিতে আন্তরিকতার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। এইসব ছবির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি ইতালিয়ান ছবি সিয়েরা মায়েস্ত্রা (Sierra Maestra)। ছবিটি তোলা হয়েছে বলিভিয়ার জঙ্গলে এবং কিউবার গেরিলা অধ্যুষিত অঞ্চলে। ফোটোগ্রাফি কতখানি ভালো হল না হল তা নিয়ে মাথা ঘামাননি পরিচালক, কারণ মাথা ঘামালে কোনও লাভ হত না, এ ছবি করার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হত। ১৬ মিলিমিটার ক্যামেরা নিয়ে লাতিন আমেরিকার দুর্গম অরণ্যে স্বল্প আলোয় ছবি তুলতে হয়েছে, বিশেষ কোনও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থার সম্ভব হয়নি। অনেক সময় হাতেই ঘোরানো হয়েছে ক্যামেরা। ছবিটি পরে ল্যাবরেটরিতে ব্লো-আপ করে ৩৫ মিলিমিটার করা হয়েছে। কেতাবি ফোটোগ্রাফি যাঁরা পছন্দ করেন, ছবিটিকে তাঁরা এককথায় বাতিল করে দেবেন। কিন্তু আমি বলব, এই "অসুন্দর" দিকটাই এ-ছবির কৌলীন্য বাড়িয়েছে। নানা দিক থেকে বিবেচনা করে এ ছবির পরিচালককে খাতির করব। বিশেষ করে পরিচালকের দুঃসাহসে স্তম্ভিত হয়েছি। পরিচালক পঞ্চাশোর্ধ্ব, কিন্তু ছবিটি তারুণ্যে ঝলমল।

রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর পরই উল্লেখযোগ্য সেক্সকেন্দ্রিক ছবি। সুপ্রচুর নগ্নতা ও যৌনতা। অধিকাংশই অর্থহীন। এতে না আছে কোনও শিল্পসত্যের প্রেরণা, না কোনও বস্তুনিষ্ঠ অপরিহার্যতার দান। নগ্নতা যদি শিল্পের প্রয়োজনে না আসে, তবে তা বিকৃতি। সন্দেহ হয়, বাস্তবতার নামে পর্নোগ্রাফিক চিত্রভাব্যে শিল্পীর বিকৃত মানসিকতার প্রতিফলন ঘটছে, শিল্পসত্যের চেয়ে ব্যাবসায়িক স্বার্থের মুখ চেয়েই হয়তো যৌনতার এই অতিচর্চা।

মজার কথা, এই সব ছবিতেই নগ্নতার কেন্দ্রবিন্দু নারী। যেখানে পুরুষ-নারী দু'জনেই নগ্ন, সেখানেও ক্যামেরার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নারীনগ্নতার ডিটেল। ইউরোপের ব্যক্তি-স্বাধীনতা তথা নারী-পুরুষের সমানাধিকারের ব্যাপারটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে আমরা মেনে আসছি। কিন্তু একটুখানি বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়ে ইউরোপের পুরুষ-শাসিত সমাজ নারীকে এখনও পণ্য হিসেবে ব্যবহার

করতেই অভ্যস্ত, নারীর ব্যক্তিমূল্যে নয়। পণ্যমূল্যই হচ্ছে প্রধান, নারীমন নয়, নারীদেহই মূল লক্ষ্যবস্তু। তাই তাঁদের চলচ্চিত্রে নারীর নগ্নতাই চর্চিত হচ্ছে যথেচ্ছভাবে। সৌন্দর্যতত্ত্বের দোহাই দিয়ে লাভ নেই, কেননা ইতিহাসের সাক্ষ্য অনায়াসেই প্রমাণ করবে অতীত ভাস্কর্যে ও চিত্রে পুরুষের নগ্নতাও শিল্পের উপাদান হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে এবং নগ্ন পুরুষের সৌন্দর্যও শিল্পবিচারে তথা সৌন্দর্যতত্ত্বের মাপকাঠিতে সফল শিল্প হতে পেরেছে। এখন হয় না। কেননা ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলোর পুরুষ-শাসিত ব্যক্তি এখনও কাঞ্চননিগড়ে বাঁধা, নারী এখনও আকর্ষণীয় পণ্যমাত্র।

আমাদের তুলনায় পশ্চিম অনেক বেশি সফিস্টিকেটেড। তাই ওদের বিন্যাসে যে চালাকি বর্তমান, আমাদের দেশের ছবিতে তা অনুপস্থিত। এবং এই চালাকি দিয়েই ওরা ওদের আসল মানসিকতাকে আপাত শিল্পসৌকুমার্যের মোড়কে লুকিয়ে রাখতে পারে। অথচ সমাজসচেতন পরিচালকের হাতে এই নগ্নতাই যে কতখানি তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে পারে, তার পরিচয়ও এই উৎসবে এবং উৎসবের বাইরের ছবিতে দেখা গেছে। লিন্ডসে অ্যান্ডারসনের 'ইফ' ছবিটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উৎসবের বাইরে দেখানো হয়েছিল ছবিটি, ধারালো ব্যঙ্গ ও বিদ্রোহী মনোভঙ্গিতে এ ছবির ফ্রেমে ফ্রেমে এক অত্যাশ্চর্য তীক্ষ্ণতা। নগ্নতার তাৎপর্যময় ব্যবহারে বক্তব্যই বড়ো হয়ে উঠেছে এখানে, নিষ্প্রয়োজন মনে হয়নি নগ্নতার শারীরিকতা।

ব্যক্তিগতভাবে নগ্নতায় আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু নগ্নতার ব্যবহার ছবিতে যদি শারীরিকতা (Physicality) ছাপিয়ে উঠতে না পারে তা হলে তা অর্থহীন বিকৃতিমাত্র এবং শিল্পের বিচারে তা মূল্যহীন হতে বাধ্য। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে বেশির ভাগ ছবিতেই বাস্তবতা ও সামাজিক অবক্ষয়ের নামে এই ধরনের শরীরসর্বস্ব নগ্নতাই দেখা গেছে এবং এসবের পেছনে মালিকের ব্যাবসায়িক চালাকিই প্রধান হয়ে উঠেছে। কলাকৌশলের মারপ্যাঁচ ব্যাপারগুলো এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে এগুলো এককথায় বাতিল করে দেওয়া যাচ্ছে না। প্রশ্ন উঠবে, নগ্নতা ও যৌনতা কোথায় শিল্প হয়ে উঠেছে কোথায় ওঠেনি, এর কোনও মাপকাঠি বেঁধে দেওয়া যায় কি? এবং যদি না যায়, গোটা ব্যাপারটা যদি শুধু Subjective-ই হয়, তবে একটি চলচ্চিত্রের বিচার কীভাবে সম্ভব হবে? শুধু নগ্নতা বা যৌনাচার কেন, যে কোনও মানবিক পার্থিব ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে এই ধরনের কোনও মাপকাঠি বেঁধে দেওয়া যায় না। গোটা ব্যাপারটাই নির্ভর করে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। ভারতীয় ছবিতে এ-যাবৎ কোনও নগ্নদৃশ্য দেখিনি। কিন্তু নারী ও পুরুষের অঙ্গভঙ্গি পর্দায় যা প্রায়ই দেখতে পাই, তা কদর্যতম

বললেও অত্যুক্তি হয় না। কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি ফরাসি চলচ্চিত্র উৎসবে আঁলা রেনের 'The war is over' ছবিটা দেখেছিলাম। ছবিতে নারী-পুরুষের দৈহিক মিলন সবিস্তারে দেখানো হয়েছে, কিন্তু দৃশ্যটি শিল্পসুষমায় উজ্জ্বল। যৌনবিকৃতি নয়, ব্যক্তিস্বরূপের জটিল গ্রন্থিগুলো উন্মোচন করাই ছিল শিল্পীর লক্ষ্য, ব্যক্তিচৈতন্য তথা সমাজমানসের দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণের ভেতরে সত্যানুসন্ধানই ছিল শিল্পীর অন্বিষ্ট। ভুলে গেলে চলবে না যে নগ্নতা ও যৌনতা শিল্পের উপাদানমাত্র, যাকে বলা যায় কাঁচামাল। এই উপাদানকে কেমনভাবে ব্যবহার করে শিল্পের গঠিত প্রতিমা নির্মাণ করা যায়, সেটা শিল্পীর বিচার্য। যিনি চলচ্চিত্রে নগ্নতা তথা যৌনতার কাঁচামালকে কাঁচামাল হিসাবেই ব্যবহার করেন এবং ব্যর্থ হন শিল্পের পরিণতি দিতে, তিনি শিল্পী নন, নিতান্ত কারিগরমাত্র, ব্যাবসাদার মালিকের টাকা তৈরির যন্ত্র ছাড়া কিছুই নন তিনি।

নগ্নতা প্রসঙ্গে সম্প্রতি খোসলা কমিটির সুপারিশ নিয়ে এখানে প্রচুর বিতর্ক হচ্ছে। কেউ কেউ বলেছেন, চলচ্চিত্রে নগ্নতার আমদানি হলে দেশ, সমাজ ও ভারতীয় ঐতিহ্য রসাতলে যাবে। বিরুদ্ধবাদীও আছেন। আর আছেন, একদল ব্যাবসাদার, যাঁরা এই সুযোগে কিছু টাকা কামিয়ে নেবার ফিকিরে আছেন। সকলেই ভুলে যেতে বসেছেন যে শিল্পের উপাদানটাই শিল্প নয় এবং উপাদানের সফল ও শিল্পসম্মত ব্যবহারেই সত্যিকারের সিদ্ধি সম্ভব, অন্য কোনওভাবে নয়। আমার তো মনে হয় খোসলা কমিটি এমন কিছু সুপারিশ করেননি, যাতে দেশ, সমাজ, ঐতিহ্য সব বাতিল হয়ে যাবে। এই সুপারিশের আগে অর্থাৎ বর্তমানেও আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের ওপর এত বাধানিষেধ চাপানো আছে, তাতে কি আমাদের ছবি ভাল্‌গারিটি থেকে মুক্তি পাচ্ছে? আসলে সুপারিশ, আইনকানুন কোনও কিছুতেই কিছু হবার নয়, যদি না শিল্পী সচেতন হন তাঁর সমাজ সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে। অবশ্যই শিল্পীর স্বাধীনতা প্রয়োজন। আমাদের সেন্সর পদ্ধতি তো শুধু বিধিনিষেধের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। আদর্শ পরিবেশ গড়ে তুলতে কী করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে সোজাসুজি কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে এইটুকু বুঝি, শিল্পীর অবাধ স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে। এবং তারই সঙ্গে প্রয়োজন গভীর দায়িত্ববোধের। কিন্তু ওই দায়িত্বের ব্যাপারটা আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, একে অর্জন করতে হয় রুচি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সততা দিয়ে।

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে তোলা ছবির সংখ্যা প্রচুর। আইন করে শিল্পীর স্বাধীনতা হরণ করলে শিল্পের পক্ষে ঘোরতর দুর্দিন। এই দুর্দিনেই আমাদের কাটছে!

অবশ্য এ কথাও ঠিক-সেন্সর ব্যবস্থার রদবদল বা খোসলা কমিটির সুপারিশে

দু' একটা ভালো কথা যা আছে তা গ্রহণ করলেই এ-দেশে হু হু করে শিল্পসম্মত ছবিতে বাজার ভরে যাবে এমন ধরনের বিশ্বাসের কোনও ভিত্তি নেই। ও-দেশেই কি হয়েছে? অনেক বিষয়েই তো অবাধ স্বাধীনতা আছে ওদের, তবু সব ছবিই শিল্প হয়ে ওঠে না। তবু পরিবেশ প্রয়োজন যাতে যথার্থ শিল্পী—যিনি জীবননিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ, জীবন ও সমাজ সত্যের কিছুর কেন্দ্র মূল থেকে যিনি আহরণ করতে পারেন শিল্পের রস, তার চারপাশ থেকে নিষেধের কাঁটাতার অবশ্যই তুলে নেওয়া উচিত। এতে সমাজের মঙ্গল, শিল্পেরও।

ছবি কতটা ভালো হল, কতটা উতরোল কতটা উতরোল না, এ নিয়ে বিতর্ক চলবেই। চলাই উচিত। মতাদর্শের বিরোধ যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে অনিবার্যভাবেই একটা অচলাবস্থার তৈরি হয় এবং সেটা কোনওভাবেই কাম্য নয়। দেখতে দেখতেই তৈরি হবে ছবি তৈরির বোল, ভাবতে ভাবতে সৃষ্টি হবে শিল্প সৃষ্টির মন, ভাঙতে ভাঙতেই গড়ে উঠবে নতুন মূল্যবোধের স্বাদ। অনেক আলোচনা-সমালোচনা, অনেক বিতর্ক কুতর্ক চলবে। চলুক। কোনটা শিল্প, কোনটা শিল্প নয়, এ নিয়ে নানা মুনির নানা মতকে উপেক্ষা করে লাভ নেই। এসব থেকেই তৈরি হবে শিল্পসম্মত ছবি এবং শিল্পবিচারেরর Objective দৃষ্টিভঙ্গি।

অবশ্যই, শেষ পর্যন্ত শিল্পবিচার Subjective. কোনও ছবি সকলের একরকম লাগবে এবং ভালো ছবি মাত্রই সকলের ভালো লাগবে, এ-কথা হলফ করে বলা যায় না। আন্তোনিওনির 'লা নত্তে'র শেষ দৃশ্য দেখে আমার এক বন্ধু বলেছিলেন, দৃশ্যটি কদর্য। এবং সবকিছুর সঙ্গে শেষ দৃশ্যটি দেখে আমার মনে হয়েছে যে ওই মুহূর্তে পরিচালক এক মহৎ সত্যের উদ্‌ঘাটন করেছেন। এবং এক মহৎ ট্র্যাজেডিরও। মিলোস ফোরম্যানের 'A blonde in love' ছবিটিতেও একই ঘটনা ঘটেছে। অনেক তর্ক-বিতর্ক ও কথা কাটাকাটির পরও শেষ বিচার দর্শকের রুচি, বুদ্ধি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপরই নির্ভরশীল। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবেও লক্ষ করেছি, একজন জাঁদরেল সমালোচক যে ছবিকে অনন্যসুন্দর বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন, অন্য এক প্রথিতযশা সমালোচক তাকে এক মুহূর্তে নস্যাৎ করেছেন। শিল্প বিচারে এ উৎসবে মতদ্বৈধতার তীব্রতা কখনও তিক্ততার সৃষ্টি করেনি, এ-উৎসব বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী মতামতের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশিষ্ট। শিল্পের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক। আমার ছবি 'ভুবন সোম' সম্পর্কে এ-ধরনের ব্যাপার লক্ষ করেছি। অনেকেরই ভালো লেগেছে, খারাপও লেগেছে কারও, কেউ কেউ বলেছেন—ঠিক আছে, ভালোমন্দ মিশিয়ে। তবে, দেশে খাতির পেতে গেলে (!) সাগরপার থেকে যতটুকু প্রশংসা পাওয়া দরকার তা যথেষ্ট পেয়েছি। তবু বলব, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র সমালোচকদের

সব কথাই যে বেদবাক্য, এ-কথা মনে করার কোনও কারণ নেই; নিজের ছবি সম্বন্ধে ভালো বললেই বর্তে গেলাম আর নিন্দে করলেই অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে গেলাম, এটাও ঠিক নয়। ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আসরের কী ধারণা, ছোটো একটা প্রতিনিধিত্বমূলক উদ্ধৃতিতে তা প্রতিফলিত করা যায় 'Teeming India, with more than 300 Pics per year, has only managed to provide one international talent—Satyajit Ray.'

কথাটা বলেছেন ইউরোপের বিখ্যাত সমালোচক জিন মস্কোভিচ, বলেছেন 'ভুবন সোম' ছবিটির সমালোচনা প্রসঙ্গে, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভূমিকা হিসেবে।

ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা অবশ্যই জানেন মস্কোভিচের উপরোক্ত মন্তব্যটি তর্কাতীত। কিন্তু ব্যাপারটা প্রায় হাস্যকর হয়ে ওঠে তখনই যখন দেখি বলা নেই কওয়া নেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই কেউ কেউ, 'সত্যজিৎ রায়' নামটি চাপিয়ে দিচ্ছেন যত্রতত্র। 'ভুবন সোম'-এর সমালোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক জন গিলেট লিখলেন:

> (Bhuvan Shome) Flashes into life with the appearance of Suhasini Mulay, one of those marvellous Bengali [!] actresses, all charm and resourcefulness, who should be snapped up by Satyajit Ray immediately.

এ-যেন মনিবকে সেবা করবার এক উৎকট মনোভাব। পশ্চিমেও দেখতে পাচ্ছি এই মনোভাব অনুপস্থিত নয়।

সম্প্রতি বার্লিনের সরকারি ফিল্ম উৎসবে প্রদর্শিত ভারতীয় ছবি 'অঙ্কুর'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে জন গিলেট মহাশয় ওই একই কথা লিখেছেন অভিনেত্রী শাবানা আজমি সম্পর্কে। ব্যাপারটা সত্যিই বড়ো অস্বস্তিকর।

যে কোনও শিল্পের পক্ষে জনপ্রিয়তা অর্জন করা খুব সহজসাধ্য নয়। তার জন্য কোনও আটপৌরে ফর্মুলা বাতলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সাধারণভাবে দেখা গেছে কিছু সস্তা উত্তেজক উপাদান থাকলেই কোনও কোনও শিল্পকর্ম অথবা তথাকথিত শিল্পকর্ম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দর্শক কিংবা শ্রোতার অথবা পাঠকের প্রতি কোনওরকম কটাক্ষ না করেই এই সত্যটাকে মেনে নেওয়া উচিত।

যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাইতে অনেক বেশি জনপ্রিয় তথাকথিত বর্তমানের হালকা লেখকেরা। সুতরাং এটা ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে সৎ শিল্পকর্মকে জনপ্রিয় করে তোলা অনেকটাই দুঃসাধ্য। বিশেষ করে যে সমাজে নানাবিধ ব্যবস্থায় গলদ প্রচুর এবং যে দেশে নিরক্ষতার বাজার জমজমাট, সেই সমাজে অথবা দেশে তো বটেই। সুতরাং ব্যাবহারিক দিক দিয়ে ভাবতে গেলে বলতে হয় যে সৎ চলচ্চিত্র আমাদের দেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পথে বেশ কিছু বাধা আছে।

তাই বাংলা চলচ্চিত্র সম্পর্কে যে সংকটের কথা বলা হয় অর্থাৎ আর্থিক সংকট অর্থাৎ যে সংকট আসে জনপ্রিয়তার অভাব থেকে-সেই সংকট কাটাতে গেলে প্রথমেই যা করণীয় তা হল—(১) কম পয়সায় ছবি তোলা অর্থাৎ স্টার সিস্টেমকে বর্জন করা এবং অকারণ, অহেতুক, অসংগত জাঁকজমক বর্জন করা; (২) চলচ্চিত্রের বাজারের পরিধি বাড়ানো অর্থাৎ আঞ্চলিক গণ্ডি ডিঙিয়ে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই সৎ চলচ্চিত্রের সামনে জনপ্রিয়তার সংকট রীতিমতো ভয়াবহ হয়ে দেখা দিয়ে থাকে এবং পৃথিবীর সর্বত্রই এই উপরোক্ত দুইটি বিষয়ের দিকে নজর দিয়ে সংকট কাটানোর চেষ্টা হয়ে থাকে। অন্তত সংকটের সঙ্গে বোঝাবুঝির চেষ্টা হয়ে থাকে।

বাংলা ভাষা যতই সমৃদ্ধিশালী হয়ে থাকুক না কেন, বাংলা সাহিত্য-শিল্প

জাতীয় জীবনে যতখানি তাৎপর্যময় হয়ে উঠুক না কেন, এ কথা মানতেই হবে যে, বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে বাংলা ছবিকে সীমিত রাখলে ছবির সংকট কাটানো সম্ভব নয়। কারণ, ছবি তৈরি করতে ন্যূনতম যে অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থ ফিরে পেতে গেলে যে বাজার দরকার, সেই বাজার সৎ ছবির দর্শকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে একেবারে চলে না। আর এ-কথা বাংলা ছবির ক্ষেত্রে যতখানি সত্য, অন্যান্য আঞ্চলিক ছবির ক্ষেত্রেও ততখানি সত্য। আমার কথা, বাংলাতে ছবি করা হোক কম পয়সায়, জাঁকজমক এড়িয়ে এবং সেই ছবিকে সর্বভারতীয় ভাষা অর্থাৎ হিন্দিতে 'ডাব' করে চালানো হোক—বাংলা অঞ্চলের বাইরে এবং বিদেশে।

তার অর্থ, ছবির মান বাড়াতে হবে। জনপ্রিয়তার খাতিরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন হালকা লেখকদের স্তরে নেমে আসেননি, তেমনি চলচ্চিত্রকারকেও সেই কথা ভাবতে হবে। কারণ একটি কথা মনে রাখতে হবে যে শিল্পকর্মকে জনপ্রিয় করার দায়িত্ব শুধুমাত্র শিল্পকর্মীরই নয়, এ দায়িত্ব শিল্পরসিকদেরও।

সরকারের কাছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়ানোর কোনও প্রয়োজন বোধ করি না। কতকগুলো ব্যবস্থা তাদের অবশ্যই করা উচিত। যথা, ছবি প্রদর্শনের সুব্যবস্থা, সেন্সারশিপের আমূল পরিবর্তন ও সরকারের ব্যাবসাদারি মনোবৃত্তির পরিবর্তন। 'সরকারের ব্যবসাদারি মনোবৃত্তি' বলতে এটাই বুঝি যে আমোদকরের নামে কোটি কোটি টাকা আদায় করছেন ছবি থেকে, অথচ সেই টাকা ছবির ব্যাবসায় আসছে না একেবারেই। সেই টাকা সরকার জমাচ্ছেন এবং অন্য কাজে ব্যয় করছেন। সরকারের উচিত এই টাকার বেশি অংশ ছবির ব্যাবসায় নিয়োজিত করা—নানা স্তরে নানাভাবে সামগ্রিক উন্নতির জন্য এবং সৎ ছবির উদ্দেশ্যে। পশ্চিমবঙ্গের জনৈক মন্ত্রী সম্প্রতি কোথাও বলেছেন বলে জানা গেছে যে সংকট কাটানোর জন্য আমাদের অবিলম্বে 'জনপ্রিয়' ছবি তৈরি করা উচিত। আমার বক্তব্য: আমার ছবি যদি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তা হলে আমিই বোধহয় সবচাইতে সুখী হব। কিন্তু কথা হচ্ছে এবং বাস্তব অবস্থা হচ্ছে অন্তত টিকিটঘরের ভিড় দেখে নিঃসন্দেহে তাই বলা চলে—তথাকথিত জনপ্রিয় ছবি মানেই মোটামুটিভাবে স্থূলরসের মোটা দাগের অশালীন ভাবনার ছবি। আশা করি, মন্ত্রীমহোদয় জনপ্রিয়তার নামে এই ধরনের ছবির কথা অবশ্যই মনে করছেন না। 'পথের পাঁচালী' জনপ্রিয় ছবি সন্দেহ নেই, কিন্তু ওটা দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতো। 'অপরাজিত' চলেনি একেবারেই এ-কথা ভুললে চলবে না। চলে না আরও বহু সৎ ছবি—এ-দেশে এবং বিদেশে। কিন্তু বিদেশের বাজার অনেক বড়ো, এটাই বাঁচোয়া।

তাই আবার বলি, ছবির জনপ্রিয়তার কথা ভেবে ওইদিকে হুমড়ি খেয়ে না পড়ে ছবির শিল্পমান বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার এবং তা আঞ্চলিক পরিবেশের বাইরে এবং বিদেশে দেখানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এবং এই বিশেষ বিষয়ে সরকার আরও অনেক তৎপর হবেন এটাই আশা করব।

. . .

শেষ কথা: সৎ ছবির পরিবেশ তৈরি করা হোক এবং তা হলেই দেখতে পাব অদূর ভবিষ্যতে একদিন সৎ ছবি সত্যি সত্যি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

সামগ্রিকভাবে সমস্ত আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের এবং বিশেষ করে বাংলার অবশ্যই অবনতি ঘটেছে। এবং এইটি একটি অনিবার্য সত্য। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল বাংলার বাজার সংকুচিত হয়েছে এবং একই সঙ্গে সর্বভারতীয় ভাষার বাজার ছড়িয়ে পড়েছে। দুইটি ঘটনার আবির্ভাবে যা ঘটবার ঘটেছে। এখন, বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে যা করণীয় করতে হবে।

আমাদের চলচ্চিত্রে সংকট দুই দিক থেকে প্রকট হয়ে উঠেছে: শিল্পগত সংকট ও আর্থিক সংকট। আঞ্চলিক বাজার ছোটো হয়ে আসতেই আর্থিক সংকট দেখা দেয়। বাজার বাড়ানোর ব্যবস্থা হল না। ফলে সংকট থেকেই গেল। চলচ্চিত্র নির্মাতারা স্বভাবতই আতঙ্কিত বোধ করলেন। ছোটো বাজারকে মেনে নিয়েই চলচ্চিত্রকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তুলতে প্রয়াসী হলেন। অর্থাৎ মাথা কম খাটিয়ে, শিল্পবোধ যতটুকু রয়েছে তাও মোটামুটি বিসর্জন দিয়ে, সস্তায় কিস্তিমাত করবার চেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করলেন। এসবই তাঁদের করতে হল চলচ্চিত্রের জগতে টিকে থাকার তাগিদে। এতে তাঁদের দায়িত্ববোধের কিছু অভাবও নিশ্চয় প্রকাশ পেল। কিন্তু সে যাই হোক, এর ফলে শিল্পবোধেও ঘাটতি প্রকট হয়ে দাঁড়াল। এবং দিনের পর দিন আর্থিক সংকট বাড়ার সঙ্গে তাল রেখে আত্মিক সংকটও বেড়েই চলল। পশ্চিমবঙ্গকে আমরা জানি সমাজচেতনার breeding ground বলে। কিন্তু সংকটের এই দু'মুখী সাঁড়াশি অভিযানের দাপটে এ-হেন সমাজচেতনার বিশেষ কোনও প্রতিফলন গত কয়েক বছরের বাংলা চলচ্চিত্রে পাওয়া গেল না। যাঁরা নতুন, যাঁরা সর্বত্র সবচাইতে নির্ভীক হয়ে থাকেন, শিল্পকর্মে যাঁরা সর্বকালে সর্বদেশে সবচাইতে বেপরোয়া—তাঁরাও গর্তে মুখ ঢুকিয়ে রাখলেন। এবং আজ দেখতে পাই, এই দু'মুখী সংকট এক ভয়াবহ চেহারা নিয়ে আমাদের সামনে ধরা দিচ্ছে।

এই সংকট সমাধানের চেষ্টা হতে পারে একটিমাত্র পথে: তা হল বাজার বাড়ানোর।

বাজার বাড়ানো বলতে আমি অবশ্যই হৃত বাজার ফিরে পাওয়ার কথা

বলছি না। দেখা গেছে, পূর্ববঙ্গে বাংলাদেশের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের অনেকেই বিশেষ উল্লসিত হয়ে উঠেছেন। উল্লসিত হয়ে উঠেছেন, কারণ তাঁরা মনে করছেন এবার বোধহয় বাংলা চলচ্চিত্রের বাজার ছড়াবে। কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে বাংলাদেশেরও চলচ্চিত্র শিল্প রয়েছে এবং সেখানেও একাধিক সমস্যা রয়েছে এবং সেখানেও সংকুচিত বাজার নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামাতে হচ্ছে। অতএব, বাংলাদেশে এবার থেকে আমরা নিয়মিতভাবে ব্যাবসা করব এই ধরনের চিন্তার মধ্যে কেমন যেন expansionism-এর গন্ধ পাওয়া যায়। এই চিন্তা বৃহত্তর স্বার্থে এবং উন্নততর সমাজবোধের খাতিরে সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

কিন্তু বাজার বাড়াতে হবে। বাড়াতে হবে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। অর্থাৎ বাংলা পরিবেশে বাংলা ছবি করে 'ভাষান্তরিত' (dubbing) করতে হবে এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এইভাবে আঞ্চলিক এবং সর্বভারতীয় ভাষায় বাংলা ছবিকে চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এবং বাংলা ছবি সম্পর্কে যা প্রযোজ্য, ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা অন্যান্য আঞ্চলিক চলচ্চিত্রকেও করতে হবে। এইভাবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সমস্ত আঞ্চলিক চলচ্চিত্র সম্পর্কে একটি Common formula তুলে ধরতে হবে। তা ছাড়া আঞ্চলিক চলচ্চিত্রকে বাঁচিয়ে রাখার এবং তার লাবণ্য বাড়িয়ে তোলার অন্য কোনও পথ আমি দেখছি না। ঠিক এই ব্যবস্থাই আমি দেখেছি বহু ভাষাভাষী সোভিয়েত দেশে। এবং এই ব্যবস্থা অদ্ভুত সাফল্য অর্জন করেছে সোভিয়েত দেশে, নানা স্তরে, নানাভাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চলচ্চিত্রচিন্তায় অনেক কিছু অস্পষ্টতা, অনেক কিছু গলদ, নানা ধরনের সংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি। এই সম্পর্কে আমি এই মুহূর্তে কিছু বলতে চাই না।

প্রসঙ্গত, যুক্তফ্রন্টের আমলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কার্যকলাপ—চলচ্চিত্রের ব্যাপারে—রীতিমতো হতাশাব্যঞ্জক।

তা ছাড়া, সরকারের কাছে আমি বিশেষ কিছু আশাও করি না। বিষয়গুলো, আমি মনে করি, প্রধানত আমাদেরই ভাবতে হবে এবং ব্যবস্থাও আমাদেরই খুঁজে বার করতে হবে। রক্ষাকবচের জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার পক্ষপাতী আমি নই।

যেহেতু হিন্দি সর্বভারতীয় ভাষা এবং যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত, সেই হেতু হিন্দি ছবি পশ্চিমবঙ্গেও যে চলবে এ তো ধরে নিতেই হবে। তবে হ্যাঁ, বড়ো বেশি চলছে আজকাল। কারণও সহজেই অনুমেয়।

হিন্দি ছবির দাপটের মুখে কীভাবে বাংলা ছবিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যেতে পারে?

এই ধরনের প্রতিযোগিতার চিন্তা—আকর্ষণীয় করে তোলার প্রতিযোগিতা—আমি মনে করি অস্বাস্থ্যকর। ছবির মান বাড়ানো হোক, ভাষান্তরিত করে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে চালানো হোক এবং সরকারি সাহায্যে ভারতের বাইরে ছবির বাজার ছড়ানোর ব্যবস্থা হোক, এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের IMPEC নামক সংস্থাটিকে ঢেলে সাজানো হোক, সুস্থ চিন্তার আমদানি হোক এই সংস্থায়। এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে Art Theatre তৈরি হোক।

হিন্দি ছবির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছু কিছু তথাকথিত 'আকর্ষণীয়' ছবি তৈরির কথা শুনেছি, পশ্চিমবঙ্গের জনৈক মন্ত্রীও নাকি বলেছেন। যদি কথাটা সত্যি হয়ে থাকে তো বলব: চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি ভদ্রলোকের বিশেষ তেমন শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা নেই।

বাজারি ছবির সঙ্গে পাল্লা না দিয়ে প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিল্পসম্মত বাস্তবানুগ ছবি নির্মাণে এগিয়ে আসা। পথপ্রান্তর রাস্তাঘাট হাটবাজার রান্নাঘর-বৈঠকখানা ইত্যাদির বাস্তবতা তখনই শিল্পগ্রাহ্য হয়ে ওঠে যখন ব্যাবহারিক জীবনের এই সমস্ত ছবির মধ্যে 'আত্মা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-হেন আত্মার সন্নিবেশ ভারতীয় ছবিতে প্রথম অসামান্য চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছিল 'পথের পাঁচালী'তে।

ধরুন, ছবিতে এবকম একটি দৃশ্য দেখছেন—বরফের দেশ। বরফে একাকার হয়ে গেছে চারিদিক। সবুজের ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও। শুধু সাদা। শুরু হল ঝড়, বরফের ঝড়। প্রচণ্ড তোলপাড়। আর তোলপাড়ের মধ্যে দেখছেন, একটা কাঠের বাড়ির অর্ধেকটা শূন্যে ঝুলছে—বাকি অর্ধেক রয়েছে বরফের ওপর। দুলছে বাড়িটা, প্রতি মুহূর্তেই অতল খাদে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। ঝড়ের এক একটা দাপট মুহুর্মুহু এসে পড়ছে বাড়ির গায়ে, আর বাড়িটা দুলছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির তলা থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে বরফ। অর্থাৎ বাড়িটার ভারসাম্য আর থাকছে না বোধ হয়। বাইরে বাড়ির এ-হেন অবস্থা, আর ভেতরে—ঘরের মধ্যে—দুটো মানুষ প্রাণপণ লড়ছে। কোনওরকমে বেরিয়ে পড়ার লড়াই, বাঁচার লড়াই। এবং শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এল, বাঁচল দু'জনেই। সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলক পড়তে না পড়তেই খাদের কোন অতলে তলিয়ে গেল বাড়িখানা। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

অথবা ভাবুন পর্দায় দেখছেন—পঙ্গু স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে, তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে এই নির্দয় পৃথিবীতে জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত এক মানুষের 'অমানুষিক' চেষ্টা—ধনী মহিলাদের সঙ্গে প্রেমের ভান করে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে তারপর সুযোগ বুঝে তাদের খুন করা এবং শেষ পর্যন্ত তাদের অর্থকড়ি আত্মসাৎ করা। ভাবুন, এমনি ঘটনা ঘটে চলেছে ছবির পর্দায়—একের পর এক—বারোটা খুন—ছোট্ট একটি পরিবারে শান্তির পরিবেশ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে।

ওপরের এই ছবিগুলো চোখের সামনে রাখতে চেষ্টা করুন ও আন্দাজ করুন ছবিঘরে দর্শকের অবস্থা। নিঃসন্দেহে দুটোই লোমহর্ষক, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী, দম-আটকানো এবং অবশ্যই ছবিঘরে চেয়ারের হাতল টেনে ধরার মতো এক অসীম অস্থিরতা। অর্থাৎ ছবিকে জনপ্রিয় করবার মতো প্রয়োজনীয় রসসঞ্চার।

অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল দুটো ছবিই—অর্থাৎ যে-দুটো ছবিতে

ওপরের ঘটনাগুলো উপস্থিত করা হয়েছিল। সমস্ত পৃথিবীতে ছবি দু'টোকে নিয়ে প্রচণ্ড আলোড়নও পড়ে গিয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক ছবির জগতে দুটি বিরাট বিস্ময় হয়ে দুটো সৃষ্টি তোলাও রইল ইতিহাসের মণিকোঠায়। এবং ছবি দুটো দেখতে দেখতে দর্শকের দম আটকেও এসেছিল সত্যি, কিন্তু ভয়, আতঙ্ক অথবা উত্তেজনায় নয়। দম আটকে এসেছিল হাসির দমকে, হাসির হুল্লোড়ে। এবং চেয়ারের হাতল চেপে না ধরার জন্য হয়তো হাসতে হাসতে বেসামাল হয়ে পড়েও গিয়েছিলেন অগুনতি দর্শক।

আজও ঠিক তাই হয়। আজও দর্শক হাসে, ঠিক তেমনি করেই। এবং তেমনি করেই হয়তো চেয়ার থেকে ছিটকে পড়তে হয় দর্শককে।

দুটোই চ্যাপলিনের ছবি। একটি হয়েছিল ১৯২৫ সালে, আর একটি ১৯৪৭ সালে। একটি 'দ্য গোল্ড রাশ' আর একটি 'মঁসিয়ে ভের্দু'।

এবং 'মঁসিয়ে ভের্দু' করবার সময়েই একবার চ্যাপলিন বলেছিলেন :

There are situations when even murder becomes comical।

Comical। এইখানেই চ্যাপলিনের বৈশিষ্ট্য, চ্যাপলিনের শিল্পসৃষ্টিতে ও শিল্পবিচারে এইটিই হল প্রথম ও প্রধান বস্তু। এই বস্তুটিকে মাথায় রেখেই চ্যাপলিনের মতো উদ্ভট ও মজাদার চ্যাপলিনেস্ক (Chaplinesque) ঢং। এবং ওই পথে, এই ঢঙে শিল্পী চ্যাপলিন আজ অর্ধশতাব্দী ধরে সমস্ত পৃথিবীকে প্রচণ্ড হাসালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই গভীরভাবে ভাবিয়ে তুললেন। এমনকি ১৯৩৮ সালে 'মডার্ন টাইমস'-এ মার্কিনি রক্ষণশীল দলগুলো যখন কমিউনিজম প্রচারের উগ্রতার গন্ধ পেলেন বা পূর্ব ইউরোপের কোনও কোনও প্রগতিবাদী সমালোচক ছবিটির ভেতর যন্ত্রযুগকে ছোটো নজরে দেখানোর অপচেষ্টার আন্দাজ পেলেন তখনও সমস্ত উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়ার মুখে চ্যাপলিন স্পষ্ট জবাব দিলেন :

Nonsense! I was only poking fun at general confusion from which we were all suffering.

Poking Fun। অর্থাৎ একই কথা, একই বৈশিষ্ট্যের প্রত্যয়। পঞ্চাশ বছরের শিল্পজীবনে এই কথাই বলে এসেছেন বহুবার বহুভাবে, শিল্পে প্রয়োগ করেছেন এই ঢং এবং অসাধারণ সার্থকতা নিয়ে ও গভীর অর্থের ইঙ্গিত দিয়ে পৃথিবীর দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন। দর্শকের হাসিতে ছবিঘর ফেটে পড়েছে মুহুর্মুহু, এবং তার পরেই হাসির আড়ালে দর্শকের মনে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে 'conception of the average man'—দৈনন্দিন জীবনে তার লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও ব্যর্থতার টুকরো টুকরো ছবি। দর্শককে তা রীতিমতো ভাবিয়েছে, দর্শককে নাড়া

দিয়েছে এবং তারই সঙ্গে আত্মসুখসন্ধানী এক প্রবল প্রতাপশালী শ্রেণির ক্রোধ ধীরে ধীরে জমে উঠেছে চ্যাপলিনের বিরুদ্ধে ছবির পর ছবিতে। সেই ক্রোধের পরিণতি ঘটল ১৯৫৩ সালে যখন মার্কিনি ওপরওয়ালাদের হামলায় অতিষ্ঠ হয়ে চিরকালের মতো আমেরিকার মাটি ছেড়ে আসতে হল চ্যাপলিনকে— সেই 'Comical' চ্যাপলিনকে, 'Funny' চ্যাপলিনকে এবং নিশ্চয়ই, সংগ্রামী চ্যাপলিনকে। এবং পৃথিবীতে মানবতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার এই বিরাট সংগ্রামে অংশগ্রহণের কথা চ্যাপলিন অত্যন্ত সহজ করে বলেছেন ১৯৫২ সালে :

'In these days of hate and suspicion I have tried to tell something about human kindness'

কথাটা 'লাইম লাইট' প্রসঙ্গে বলেছিলেন চ্যাপলিন, কিন্তু তাঁর সমস্ত শিল্পজীবন ঘিরে তাঁর প্রতিটি চিত্রে ছোট্ট এই কথাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপস্থিত ছবির পর্দায়, দর্শকের মনে। ঠিক যেমন উপস্থিত তাঁর প্রতিটি শিল্পকর্মের এক সহজ সুন্দর 'conception of the average man'।

'দ্য গোল্ড রাশ'-এও এই average man নিয়েই শুরু। সেই বিত্তহীন, ব্যর্থপ্রাণ ভবঘুরে। বহু পথ ঘুরে, বহু পরিবেশ ডিঙিয়ে, বহু চরিত্রকে পিছনে রেখে এসে দাঁড়াল এক নতুন দেশে। বরফের দেশে। একা। এবং সেই বেশে। বিংশ শতাব্দীর এক অননুকরণীয় সৃষ্টি আজব সাজে, যে-সাজ সম্পর্কে চ্যাপলিন এক জায়গায় বলেছেন :

> That costume helps me to express my conception of the average man, of almost any man, of myself. The derby is striving for dignity. The moustache is vanity. The tightly buttoned coat and the stick and his whole manner are a gesture towards gallantry and dash and front. He is trying to meet the world bravely to put up a bluff and he knows that tool. He knows it so well that he can laugh at himself and pity himself a little.

ভবঘুরের যাত্রা আবার শুরু হল, সোনার সন্ধানে আবার বেরিয়ে পড়ল সে। সহজ সরল সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি খুদে ভবঘুরে ছুটল রামধনুর দেশে— আলোর আশায়—চালু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায়। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার জীবনের সীমাহীন লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতাকে খুদে ভবঘুরেটির সমস্ত বৈশিষ্ট্য দিয়ে চ্যাপলিন ফুটিয়ে তুললেন অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে—সেই আজব ঢঙে, আজব কায়দায়। অনাবিল হাসির আবরণে চ্যাপলিন কটাক্ষ করলেন গর্বস্ফীত সমাজের গোটা ব্যবস্থাকে যার ভিত গড়ে উঠেছে স্বর্ণ-মানের ওপর এবং যেখানে, চ্যাপলিনেরই ভাষায়, দশজনের মধ্যে নয়জনই

হচ্ছে গরিব, নয়জনই যেখানে লাঞ্ছিত। তিনি ব্যঙ্গ করলেন সামাজিক বৈষম্যকে, ব্যঙ্গ করলেন ঠুনকো আভিজাত্যবোধকে, ঔদ্ধত্য, শঠতা আর মিথ্যা ভড়ংকে— এবং সবকিছুই করলেন স্বকীয় চ্যাপলিনেস্ক ঢঙে, কৌতুকরস সৃষ্টির মূল সূত্রটিকে অবলম্বন করে। অর্থাৎ বেয়াড়া পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গিয়েও মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক হওয়ার প্রাণান্তকর ও হাস্যকর প্রয়াসের ভেতর দিয়ে চ্যাপলিন চিত্রায়িত করলেন তাঁর জীবনদর্শন। ফলে সমাজের অব্যবস্থা, অবিচার ও অসংগতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, বিদ্রোহ অথবা বিরূপতা সরাসরি ছবিতে স্থান পেল না, যেমন স্থান পায়নি চ্যাপলিনের অন্য কোনও ছবিতে। তার বদলে তিনি দেখালেন, প্রতিকূল আবহাওয়ায় পীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়েও এক 'খুদে ভবঘুরে' জীবনের সমস্ত ব্যর্থতার জ্বালা কাটিয়ে উঠে সমাজের মেকি মূল্যবোধগুলিকে আশ্রয় করে নিজেকে সমাজের ওপরতলায় প্রতিষ্ঠিত করার অর্থাৎ নিজেকে 'জাতে' তোলার দুরন্ত কসরতে মশগুল হয়ে আছে। অর্থাৎ চ্যাপলিনের ভাষায়, 'trying to meet the world bravely to put up a bluff'। প্রতি মুহূর্তেই বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে তাকে, তবু সেই বেয়াড়া পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনার তার সে কী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা! যেন কিছুই হয়নি তার, যেন সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক, সহজ পরিবেশেই সে বিচরণ করছে! পরিণতি ঘটছে ব্যর্থতায়, বিপর্যয়ে, লাঞ্ছনায় সৃষ্টি হচ্ছে হাস্যকর পরিস্থিতির এবং চ্যাপলিনের কথায়, 'he knows it so well that he can laugh at himself and pity himself a little'। কিন্তু অদম্য উৎসাহ এই খুদে মানুষটির। সমস্ত বঞ্চনাকে ঝেড়ে-মুছে খানিকটা দার্শনিক বৈরাগ্যের চালে একবার ঘাড় নাচিয়ে ঠোঁট উলটিয়ে আবার টুকটুক করে চলল সে এগিয়ে নতুন ঘটনা ঘটাতে, নতুন করে দর্শককে হাসাতে ও ভাবাতে এবং নিজেও লুকিয়ে লুকিয়ে একটু হাসতে। প্রতি মুহূর্তে নিজেও যেমন হাস্যাস্পদ হয়ে উঠছে অভিনীত চরিত্র ও দর্শকের চোখে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের চোখের সামনে হাস্যকর করে তুলে ধরেছে বড়োলোকদের ভারী ভারী মূল্যবোধগুলোকে এবং শেষ পর্যন্ত, ছবির শেষে, নানা ঘটনা ঘটিয়ে নানা হইহুল্লোড় চুকিয়ে নানা অস্বস্তিকর ফারাক সরিয়ে জর্জিয়াকে কাছে টেনে নিল 'খুদে ভবঘুরে' এবং দর্শকের এতটুকু পরোয়া না করে তাদের বেমালুম ভুলে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অডিটোরিয়ামকে পিছন করে প্রেমিকার হাত ধরে সোজা হেঁটে গেল ক্যামেরার নাগালের বাইরে। দর্শকের কানে বেজে উঠল কমেন্টারি—'Happy ending, happy ending'। চ্যাপলিনেরই অননুকরণীয় গলায়। শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই ছবিঘরের আলো জ্বলে উঠল। ছবি শেষ।

দর্শকের কানে তখনও বাজছে কথাগুলো—'Happy ending, happy

ending' এবং হয়তো কেমন যেন ঠাট্টার মতো বাজল দর্শকের কানে—'Happy ending, happy ending' হয়তো, হলিউডের সেকেল-বাঁটা 'হ্যাপি-এন্ডিং'-এর parody'-র মতো।

এবং সত্যিই, সভ্যতার আরও দারুণ দুর্যোগের মুহূর্তে ১৯৪০ সালে 'দ্য গ্রেট ডিকটেটর'-এ চ্যাপলিন কিন্তু সেই happy ending করলেন না। ঠাট্টা ছেড়ে শক্তভাবে জানালেন তিনি পরিষ্কার ভাষায় :

> It would be much easier to have the barber and Hanna disappear over the horizon, off to promised land against the growing sunset. But there is no promised land for the oppressed people of the world. There is no place over the horizon to which they can go for santuary. They must stand and we must.

শুধু 'দ্য গোল্ড রাশ'-ই নয়, চ্যাপলিনের সমস্ত শিল্পমানসে এই একটি বিশ্বাসই আকাশ-প্রমাণ হয়ে ধরা দেয় পৃথিবীর দর্শকের চোখে—'They must stand and we must' আর চোখে ভাসে সেই একটিমানুষ—'খুদে ভবঘুরে'—বিচিত্র পোশাকে ছড়ি হাতে টুকটুক করে যে হেঁটে চলেছে গল্প থেকে গল্পান্তরে—এবং যে চরিত্রটির ভেতর দিয়ে চ্যাপলিন গড়ে তুলেছেন 'conception of the average man'

এবং আবার সেই ঠাট্টার সুরে যে-চরিত্রকে চ্যাপলিন বলেছেন—'A fallen aristocrat at grips with poverty'.

সে Fallen aristocrat-কে আবার নতুন করে দেখবার সুযোগ পেলেন কলকাতা দর্শক—'দ্য গোল্ড রাশ'-এ।

বিংশ শতাব্দীর এক অসামান্য সৃষ্টি এই fallen aristocrat, যাকে বুকের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে ভালোবেসেছেন পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ এবং যে-খুদে লোকটি রীতিমতো নাজেহাল করে তুলেছে মুষ্টিমেয় এক দাম্ভিক শ্রেণিকে।

I have known humiliations. And humiliation is a thing you cannot forget.

কথাটা একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন চার্লি চ্যাপলিন, বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী চ্যাপলিন, সমাজের একেবারে নিচুতলার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় শিল্পী চ্যাপলিন—মানুষ চ্যাপলিন। জীবনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যে মানুষটি অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছেন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে, বিশ্বপ্রকৃতির সমস্তরকম অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলার সঙ্গে—পৃথিবীতে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে—শিল্পসৃষ্টির প্রসঙ্গে একদিন এই কথাগুলো বলেছিলেন তিনিই। চার্লি চ্যাপলিনের জীবন ও শিল্পের হিসেবনিকেশের খাতায় কথাটার গুরুত্ব প্রচণ্ড।

লন্ডন শহরের কোনও বস্তিতে চার্লি চ্যাপলিনের জন্ম। মা ছিলেন লন্ডনের একটি নাচিয়ে দলের নাচিয়ে, বাবা সেই দলেরই এক গাইয়ে। বাপ-মা দু'জনেই নাচগান করে, এক দল ছেড়ে আর এক দলে চাকরি করে সংসার চালাতেন। সংসারটা পুরোদস্তুর অগোছালো হয়েই থাকত, বিশৃঙ্খলার সীমা ছিল না। স্বভাবতই, চ্যাপলিনের ছেলেবেলাটাও কেটেছিল নিতান্তই অনাদরে আর অবহেলায়, ছেলেবেলার একটা মূল্যবান সময় ওঁর কেটেছিল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, আধপেটা খেয়ে আর বাউণ্ডুলেগিরি করে।

পাঁচ বছর বয়সে চ্যাপলিনের নাট্যজীবনের হাতেখড়ি। মা একদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, মা-র পরিবর্তে বাবা ছেলেকে সে দিন থিয়েটারে নিয়ে গেলেন, একরকম ঠেলেই ঢুকিয়ে দিলেন স্টেজে। প্রথমে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ কী হল—দারুণ চেঁচিয়ে উঠলেন, গলা ফাটিয়ে গান জুড়ে দিলেন। থামানো যায় না কিছুতেই। অডিটোরিয়াম থেকে টাকাপয়সা এসে পড়ল স্টেজে। সঙ্গে সঙ্গে গাইয়ের উৎসাহের মাত্রা বেড়ে গেল শতগুণ, গান শেষ করে নতুন গান ধরলেন—গেয়েই চললেন এবং

শেষ পর্যন্ত বাবা যখন ঠেলে ওঁকে পর্দার আড়ালে নিয়ে গেলেন তখন ছেলের গান থামল। বাবা হঠাৎ একদিন মারা গেলেন, গরিব সংসারের উপার্জনক্ষম একজন কমে গেল, দক্ষিণ লন্ডনের কেনিংটন বস্তির বাসিন্দা হলেন এঁরা। নগণ্য পল্লি এই কেনিংটন বস্তি, তার চেয়েও নগণ্য এখানকার মানুষগুলি; আশা-আকাঙক্ষা, হাসি-আনন্দ কোনও কিছুরই সন্ধান মেলে না এখানে। চারিদিকে যা ছড়িয়ে রয়েছে—পথে, ঘাটে, অন্ধকার খুপরিগুলোতে তখন প্রতিটি মানুষের চোখে-মুখে তা শুধু দুঃখ আর দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা। আর এরই মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন চার্লি চ্যাপলিন সমাজের নীচের তলার মানুষের সঙ্গে—আশাহত লাঞ্ছিত মানুষ।

ছেলেবেলাকার এই যে হাজারো বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা, ছেলেবেলাকার এই ব্যর্থতা, জ্বালা, এই লাঞ্ছনা ধীরে ধীরে চ্যাপলিনের মনে জাগিয়ে তুলল এক চরম ট্র্যাজেডির বোধ। এক বিরাট বেদনাবোধ উদ্‌বেল হয়ে উঠল বঞ্চনার গভীর থেকে এবং ধীরে ধীরে তাই ব্যক্তির সীমানা ছাড়িয়ে মিশে গেল মহাসমুদ্রের সঙ্গে—এক সীমাহীন বেদনাবোধ সমস্ত লাঞ্ছিত মানবাত্মার বোবা ভাষাকে মুখর করে তুলল। তাই দেখা যায় বড়ো হয়ে চ্যাপলিন যেখানেই তাঁর ছেলেবেলাকার কথার এতটুকু উল্লেখ করেছেন—বস্তি, মানুষ বা কোনও ঘটনা—সেখানেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে একটা গভীরতর ট্র্যাজেডির ছবি। আমেরিকায় কর্মমুখর কয়েকটা বছর কাটিয়ে পৃথিবীজোড়া খ্যাতি অর্জন করে যখন চ্যাপলিন স্বদেশে ফিরলেন তখন কেনিংটন পার্ক প্রসঙ্গে তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন:

> How repressing to me are parks! The loneliness of them. One never goes to a park unless one is lonesome. And lonesomeness is sad. The symbol of sadness, that's a park.

The symbol of sadness, that's a park. ঠিক এমনি করেই নিজেকে এবং পারিপার্শ্বিককে ঘিরে সমস্ত কিছুকেই চ্যাপলিন দেখেছেন ব্যক্তির সীমানা ডিঙিয়ে, দেখেছেন গভীরতর অনুভূতি দিয়ে। বস্তি, পথঘাট, মানুষ, ঘটনা, সবই যেন সেই অনুভূতির সেই বিরাট বঞ্চনার প্রতীক। অনেকদিন পরে, প্রচণ্ড খ্যাতির পরে স্বদেশে ফিরে সেই পুরোনো কেনিংটন পার্কে দাঁড়াতেই তাঁর মনে পড়ে গেল কত কথা—মনে পড়ল সেই অপরিণত বয়সের প্রথম প্রণয়ের কথা। চ্যাপলিন তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন:

> It was here that I had my first appointment with Hetty. How I was dolled up in my little tight-fitting frock-coat, hat & cane! I was quite the rude as I watched every street car until 4 o'clock, waiting for Hetty to step off, smiling as she saw me waiting. I

get out and stand there for a few moments at Kennington Gate. My taxi driver thinks I am mad. But I am forgetting taxi driver. I am seeing a lad of nineteen, dreseed to the pink with fluttering heart, waiting, waiting for the moment of the day when he and happiness walked along the road. The road is so alluring now. It beckons for another walk and as I hear a street car approaching I turn eagerly, for a moment almost expecting to see the same trim Hetty step off, smiling. The car stops, couple of men get out. An old woman—some children. But no Hetty is gone. So is the lad with the frock coat and cane.'

স্বদেশে ফিরে এসেই চ্যাপলিন সেই মেয়েটির খোঁজ নিয়েছিলেন এবং জানতে পেরেছিলেন যে মাত্র দু'বছর আগে সে মারা গেছে এই লন্ডন শহরেই। সবটাই চ্যাপলিনের প্রথম বয়সের প্রেমিকাকে কেন্দ্র করে লেখা অথচ বেদনাবোধটি নিতান্ত ব্যক্তিগত হয়েও যেন ব্যক্তির উর্ধ্বে এক বৃহত্তর অনুভূতির আস্বাদ মেলে প্রতিটি কথায়, প্রতিটি চিন্তায়। এবং নিঃসন্দেহে এই অনুভূতিই চ্যাপলিনের শিল্পসৃষ্টির উৎস। অর্থাৎ চ্যাপলিন তাঁর সৃষ্টির মূল উপাদান কুড়িয়ে পেয়েছেন তাঁর ছেলেবেলাকার জীবনযাত্রার ভেতর থেকে। এখানেই তিনি চিনেছেন দুঃখকে, চিনেছেন দারিদ্র্যকে, মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছেন, রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটেছে এখানেই। আবার এই শক্ত কঠিন লাঞ্ছিত জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে খাঁটি সোনার মতো সাচ্চা প্রাণেরও হদিশ তিনি পেয়েছেন এই পোড়-খাওয়া, শিরদাঁড়া ভাঙা মানুষেরই মধ্যে। এরই মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন প্রাণের পরিবেশ, পেয়েছেন সৃষ্টির প্রেরণা এবং পরবর্তী জীবনে চ্যাপলিন তাঁর শিল্পসৃষ্টির এই উৎসের কথা, এই বেদনাবোধের কথা বলেছেন অতি সহজ করে, অনাড়ম্বর ভাষায়:

I have known humiliations. And humiliation is a thing you cannot forget.

এরপর নানা উঠতি-পড়তির মধ্য দিয়ে কয়েকটা বছর ডিঙিয়ে চার্লি চ্যাপলিন লন্ডনের এক ভ্রাম্যমাণ নাচগানের দলের শিল্পী হয়ে এসে দাঁড়ালেন আমেরিকায় এবং সেখানে সেই মিউজিক হল কনোডির ভেতর দিয়ে, প্যান্টোমাইমের আশ্চর্য সুন্দর ব্যবহার করে আমেরিকার বিদগ্ধজনের মনোহরন করলেন এবং আকৃষ্ট করলেন বিশ্ববিখ্যাত চিত্র পরিচালক ডি. ডব্লিউ. গ্রিফিথের কৃতী ছাত্র ম্যাকসেনেটকে। চার্লি চ্যাপলিন ম্যাকসেনেটের নেতৃত্বে কিস্টোন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং এক বছরের মধ্যেই 'Kid Auto Races at Venice' ছবিতে চ্যাপলিন যে-সাজে আত্মপ্রকাশ করলেন,

সেই সাজটিই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে উঠল বিশ্ববিখ্যাত। সে দিন এক আকস্মিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে সকলের অজ্ঞাতে যে সং-এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল—ধীরে ধীরে কাহিনির বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের উত্তরোত্তর বিকাশের ভেতর দিয়ে পোশাক-পরিচ্ছদের কিছু কিছু পরিবর্তন হল এবং বিংশ শতাব্দীর এক অনবদ্য সৃষ্টি হয়ে উঠল চার্লি—এক অদ্ভুত সাজে, খুদে ভবঘুরের সাজে—A fallen aristocrat at grips with poverty. এবং সেই থেকে টুকটুক করে হেঁটেই চলেছে চার্লি চ্যাপলিন নিজের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে—বিভিন্ন কাহিনিতে বিভিন্ন ঘটনা ও পরিবেশের মধ্য দিয়ে। একটানা এমনিই চলল ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৪০ সালে 'Great Dictator'-এ আংশিক ও ১৯৪৭ সালে 'M. Verdoux'-এ সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল ওই পোশাকটির। 'Limelight' ও 'A king in New York'-এও এই সাজটি অনুপস্থিত। ভবিষ্যতের ছবিতে এই খুদে ভবঘুরের আর দর্শন মিলবে কি না জানা নাই, কিন্তু মিলুক আর নাই মিলুক, দীর্ঘদিন পরে চ্যাপলিন ওই লোকটির মারফত যে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের ও মননশীলতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন সেইজন্যই 'খুদে ভবঘুরে'টি শুধু সিনেমা শিল্পেই নয়, পৃথিবীর সংস্কৃতির ইতিহাসে তথা সভ্যতার ইতিহাসে চিরকালীন হয়ে থাকবে।

চ্যাপলিন তাঁর এই ঢিলেঢালা ট্রাউজার, আঁটোসাঁটো কোট, বাউলের টুপি, ছড়ি আর বিটকেল ডার্বিজুতো বিশিষ্ট কিম্ভূতকিমাকার পোশাক সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছেন:

> That costume helps me to express my conception of the average man, of almost any man, of myself. The derby is striving for dignity. The moustache is vanity. The tight buttoned coat and the stick and his whole manners are a gesture towards gallamtry and dash and front. He is trying to meet the world bravely to put up a bluff and he knows that too. He knows it so well that he can laugh at himself and pity himself a little.

বিত্তহীন ব্যর্থপ্রাণ ভবঘুরে! চ্যাপলিন একে দেখেছেন কেনিংটনের বস্তিতে, অলিতে-গলিতে অন্ধকার খুপরিগুলোতে, ধুঁকে ধুঁকে মরা প্রতিটি মানুষের চোখে-মুখে। চ্যাপলিন একে দেখেছিলেন কেনিংটন বস্তির সদর রাস্তায় অগুনতি মানুষের ভিড়ের মধ্যে। বিস্তর মানুষ, বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র তাদের চরিত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, চেহারা—বিচিত্র তাদের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি। রাস্তার ধারে ভাঙা ঘরের জানালা খুলে চ্যাপলিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছেন। মা-র পাশে থেকেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মা তাঁর ছোট্ট চার্লিকে সামনে দাঁড় করিয়ে হাত পা নেড়ে নানা-রকম

অঙ্গভঙ্গি করে নিখুঁত অভিনয় করেছেন রাস্তার ওই মানুষদের সামনে। ছোট্ট চ্যাপলিন দেখেছেন মজা করে—চোখ দিয়ে, এবং পরবর্তী জীবনে শিক্ষানবিশি অধ্যায় পেরিয়ে শিল্পী চ্যাপলিন তাই দেখলেন, চৈতন্য দিয়ে intellectual perception দিয়ে—এবং তারই ভেতর দিয়ে খুঁজে পেলেন তাঁর conception of the average man, of any man, of himself এবং বিদ্রুপ, সংবেদনশীলতা ও চমৎকারিত্বের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ এক দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রকাশিত হল তাঁর সাজপোশাক, তাঁর ম্যানারিজ্‌ম্‌, তাঁর অ্যাকশন ও তাঁর Content এবং Form। অনাবিল হাসির আবরণে চ্যাপলিন কটাক্ষ করলেন গর্বস্ফীত সমাজের গোটা ব্যবস্থাকে যেখানে চ্যাপলিনেরই হিসেবমতো দশজনের মধ্যে ন'জনই হচ্ছে গরিব, ন'জনই সেখানে লাঞ্ছিত। তিনি তাঁরই নিজস্ব কায়দায়—Chaplinesque ঢঙে ব্যঙ্গ করলেন সামাজিক বৈষম্যকে, ধর্মান্ধতাকে, ব্যঙ্গ করলেন ঠুনকো আভিজাত্যবোধকে, ওপরতলার ঔদ্ধত্য, শঠতা আর মিথ্যে ভড়ংকে। কিন্তু সবই চ্যাপলিন করলেন কৌতুকরস সৃষ্টির মূল সূত্রটিকে অবলম্বন করে অর্থাৎ বেয়াড়া পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গিয়েও মানুষের সহজ স্বাভাবিক হওয়ার প্রাণান্তকর ও হাস্যকর প্রয়াসের ভিতর দিয়ে তিনি রূপান্তরিত করলেন তাঁর জীবনদর্শন। ফলে সমাজের অব্যবস্থা, অবিচার ও অসংগতির বিরুদ্ধেসাধারণ মানুষের, average মানুষের বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ সরাসরি তাঁর ছবিতে স্থান পেল না। তিনি দেখালেন প্রতিকূল আবহাওয়ায় পীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়েও এক 'খুদে ভবঘুরে' জীবনের সমস্ত ব্যর্থতার জ্বালা কাটিয়ে উঠে, সমাজের মেকি মূল্যবোধগুলোকে আশ্রয় করে নিজেকে সমাজের ওপরতলায় প্রতিষ্ঠিত করার অর্থাৎ নিজেকে 'জাতে' তোলার দুরন্ত কসরতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রতি মুহূর্তেই বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে লোকটিকে, তবু সেই বেয়াড়া পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার বিরাম নেই। যেন কিছুই হয়নি তার, যেন সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক, সহজ পরিবেশেই সে বিচরণ করছে! পরিণতি ঘটে ব্যর্থতায়, বিপর্যয়ে, লাঞ্ছনায়—সৃষ্টি হয় হাস্যকর পরিস্থিতির। কিন্তু অদম্য উৎসাহ এই খুদে মানুষটির। সমস্ত বঞ্চনাকে ঝেড়ে মুছে খানিকটা দার্শনিক বৈরাগ্যের চালে একবার ঘাড় নাচিয়ে, ঠোঁট উলটিয়ে আবার টুকটুক করে চলে নতুন উদ্যমে, নতুন কাহিনিতে, নতুন পরিবেশে। এবং এইভাবেই 'He is trying to meet the world bravely to put up a bluff and he knows that too. এবং He knows it so well that he can laugh at himself and pity himself' a little. দর্শক হাসল। পৃথিবীর দশজনের মধ্যে ন'জন প্রাণ ভরে হাসল, কিন্তু এইখানেই দর্শক থামল না। এই হাসির আড়ালে যে একটা যুগের গভীর ট্র্যাজেডি

লুকিয়ে রয়েছে, তার সুরও দর্শকের মর্মে গিয়ে পৌঁছোল। ব্যর্থতার গ্লানি যে লোকটিকে এতটুকু দমাতে পারে না, মানুষের মতো পুরো সম্মান ও সম্ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকার উদগ্র কামনার অচঞ্চল বিশ্বাসে বুক বেঁধে যে এড়িয়ে চলেছে টুকটুক করে গল্প থেকে গল্পান্তরে—সেই খুদে ভবঘুরের প্রতি, সেই অতি সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনায় দর্শকের মন উপচে উঠল। অফুরন্ত হাসির আড়ালে মূর্ত হয়ে উঠল এক চরম বেদনার ছবি, চ্যাপলিন একাধারে হয়ে উঠলেন বিংশ শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান ও ট্র্যাজেডিয়ান।

ছোটো বড়ো কতকগুলো ছবি তৈরি করে 'A dog's life', 'Shoulder Arams' এবং আরও কয়েকটি এবং শেষ পর্যন্ত ১৯২২ সালে ছ'রিলের ছবি 'Kid' শেষ করে চ্যাপলিন হঠাৎ একদিন ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করলেন। জাহাজে সবাই তাঁকে ঘিরে ধরলেন, নানা কথা, নানা প্রশ্ন উঠল তাঁকে নিয়ে। জাহাজের যাত্রীরা তাঁকে প্রশ্ন করলেন নানা ধরনের। তিনি বলশেভিক কি না এই প্রশ্নের জবাবে চ্যাপলিন পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন: 'I am an artist, I am interested in life. Bolshevism is a new phase of life. I must be interested in it'. আর একজন প্রশ্ন করেছিলেন—কে বড়ো, লেনিন, না লয়েড জর্জ? চ্যাপলিন তাঁর ভঙ্গিতে ছোটো করে বললেন—One works, another plays.

ইংল্যান্ডে অসামান্য সম্মান পেলেন চ্যাপলিন। চারিদিকে হই চই পড়ে গেল। কিন্তু এই বিরাট শোরগোলের আড়ালে চ্যাপলিন নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে ভুললেন না। একা একা সকলের অজান্তে লক্ষ লক্ষ উৎসুক মানুষের নজর এড়িয়ে তিনি ঘুরে বেড়ালেন লন্ডনের নোংরা অলিতে-গলিতে, কেনিংটন বস্তিতে, ল্যাম্বেথের তিন নম্বর প্যানাল টেরাসের অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন ওপরে। চোখ খুলে সমস্ত দেখলেন চ্যাপলিন, চৈতন্য দিয়ে বুঝলেন সব, হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে আর একেবারের মতো অনুভব করলেন পারিপার্শ্বিককে—নতুন প্রেরণা, নতুন উদ্যম, নতুন আবেগ সঞ্চারিত হল সমস্ত দেহে, সমস্ত অস্তিত্বে; এবং গোটা অতীতটা মুখর হয়ে উঠল, physically palpable হয়ে উঠল—I have known humiliation... you cannot forget.

ল্যাম্বেথের গলিতে সেই অন্ধ বৃদ্ধ গাইয়ের মুখোমুখি হলেন চ্যাপলিন—সেই পুরেনো গান, সেই সুর—You are my honey, honey suckle!—চ্যাপলিন সেই গান আবার শুনলেন, চোখ জলে ভরে উঠল, তারপর ভিড় জমার আগেই পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

উত্তরকালে একদিন আমেরিকার এক বিখ্যাত সাংবাদিককে চ্যাপলিন হেসে

বয়সের এই অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'আজ আমার তেষট্টি বছর বয়স। কিন্তু আজও আমি বেশ চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সেই বৃদ্ধ গাইয়েকে যার গান আমি প্রথম শুনেছিলাম আমার সাত বছর বয়সে:

> You are my honey, honey suckle! তিনি বললেন, It was here that I discovered music or where I first learnt its rare beauty, a beauty that had gladdened me from that moment.

ইউরোপ থেকে এলেন চ্যাপলিন—ফিরে এলেন humiliations আর honey suckle-এর তিক্ত-মধুর স্মৃতি ঘেরা জন্মভূমি থেকে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রেরণা জোগাল নতুন সৃষ্টির। এল 'A woman of Paris'—নতুন চ্যাপলিনের সন্ধান পেলাম আমরা—কমেডিয়ান বা হাস্যরসিক চ্যাপলিন এলেন ট্র্যাজেডিয়ান রূপে। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে কেমন করে মানুষ ভুল করে, যে-ভুল তাকে নিয়ে যায় সর্বনাশা পরিণতির পথে, তা-ই A woman of Paris-এর বিষয়বস্তু। সাধারণ ঘটনাকে চার্লি অসাধারণ তাৎপর্যে ভরে তুলতে পারেন—এ কথা এ-ছবি দেখেও বারবার মনে হয়। মনে পড়ছে, মেরি তার প্রেমিককে বলছে তার বড়ো আশা: একটি ঘর আর কয়েকটি সন্তান। সঙ্গে সঙ্গে জানালার কাছে গিয়ে ওর প্রেমিক দেখাচ্ছে—রাস্তা দিয়ে চলেছে এক নারী তার সন্তানকে প্রহার করতে করতে, স্বামীটি বইছে বিরাট বোঝা আর, আরও দু'টি ছেলেমেয়ে আসছে পেছনে। তবু এ-ছবি নিয়ে অনেক তর্ক উঠেছিল। চ্যাপলিনের অনুরাগীদের মধ্যে অনেকেই চাইলেন কমেডিয়ানকে ফিরে পেতে। চার্লিও বোধহয় বুঝলেন, কমেডির মধ্যে দিয়ে জীবনের অসংগতি ফোটাবার ক্ষমতাই তাঁর বেশি। তাই আবার তিনি ফিরলেন পুরোনো ফর্মে—দু'বছর পরেই এল 'The Gold Rush'। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পটভূমিকায় তোলা ছবি এটি। সোনার হরিণের উন্মত্ত অনুসরণে মনুষ্যত্বের বিনাশ ঘটছে—এ-কথাই বলেছেন চ্যাপলিন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে। ফরাসি জনগণের মুক্তি আন্দোলনে এ-ছবি যে কী পরিমাণ প্রেরণা জুগিয়েছিল তা আজ আর বোধহয় কারও অজানা নয়।

১৯২৮ সাল। আবার আলো জ্বাললেন চ্যাপলিন—আবার দেখল সারা দুনিয়া অবাক বিস্ময়ে 'City Lights'। এ-ছবির বক্তব্য-বিষয়কে হয়তো পুরোপুরি অভিনব বলা চলে না। সামাজিক শক্তির আক্রমণে মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকৃতির ছবি এর আগেও আমরা পেয়েছি চ্যাপলিনের কাছ থেকে; তবুও বিন্যাসের জাদুস্পর্শে 'City Lights'-কে স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলে মেনে নিতে এতটুকু সংকোচ আসে না। শান্তি ও ঐশ্বর্যের প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন দিয়ে ছবির শুরু। সেই পুরোনো পরিচিত ভবঘুরে চরিত্রের নানান অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শান্তি আর

ঐশ্বর্যের মিথ্যা স্তোকবাক্যের ওপর নির্মম আঘাত হেনেছেন তাঁর অসাধারণ অননুকরণীয় ভঙ্গিতে।

১৯২৮ সাল সিনেমার ইতিহাসে এক স্মরণীয় বছর—ফিল্মে শব্দ-ব্যবহার পদ্ধতি এই বছরেই আবিষ্কৃত হল। হইহই পড়ে গেল—কেউ বললেন নতুন দিগন্ত খুলে গেল, আবার অনেকে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন—চলচ্চিত্রের দৃশ্য ভাষার নিদারুণ ক্ষতির কথা ভেবে চ্যাপলিনও তখন মনে করেছিলেন শব্দ জুড়লে চার্লির universality ক্ষুণ্ণ হবে, ছবিতে শিল্পগত মানও নেমে যাবে। চ্যাপলিন City Lights-এ শব্দ ব্যবহার করলেন না, শুধু ব্যবহার করলেন incidental sound-এর।

...১৯৩১ সালে চ্যাপলিন দেখা করলেন বার্নার্ড শ-এর সঙ্গে। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে শ বললেন চার্লি সম্পর্কে, 'The only genius developed in Motion pictures' এই বছর চার্লির জীবনের আর এক স্মরণীয় ঘটনা ইউরোপে আবার যাত্রা। চ্যাপলিন জানালেন তাঁর emotional stimulus-এর প্রয়োজন—তাই ইউরোপে তাঁর যেতেই হবে।

ইউরোপে তখন দারুণ অর্থনৈতিক সংকট—জাতীয় জীবনের এই চরম বিপর্যয়ে শিল্পী চ্যাপলিন শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। রাষ্ট্রীয় নেতাদের সঙ্গে তিনি এই সমস্ত নিয়ে বহু আলোচনা করলেন, সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার কথাটাকে বারবার তিনি তাঁদের জানিয়ে দিলেন—বললেন, 'Reduce the hours of labour, abolish gold standard, print more money and control prices'.

বিশিষ্ট নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যা নিয়ে শিল্পী চ্যাপলিনের নানারকম আলোচনা হল। জার্মানিতে গিয়ে তিনি বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করলেন এবং গভীর আলোচনা করলেন। আইনস্টাইন ওঁর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—কে বলে আপনি কমেডিয়ান। আপনি তো দেখছি পুরোদস্তুর Economist!

কালের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে চ্যাপলিনও এগিয়ে চলেছেন। আধুনিককালের কথা বলতে এলেন চার্লি তাঁর নতুন সৃষ্টিতে—চিত্ররসিকদের কাছে ১৯৩৬-এ উপহার এল 'Modern Times'। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখল দুনিয়ার মানুষ—ছবির একপাল ভেড়াকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নিধনশালার দিকে, প্যারালাল শটে একদল শ্রমিক চলেছে কারখানার দিকে। ছি-ছি করে উঠলেন সমাজের ওপরের তলার লোকেরা—কারখানারূপী নিধনশালার মালিকেরা। চ্যাপলিন আত্মপ্রকাশ করলেন একটি শ্রমিক চরিত্রে—এই শ্রমিকের আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, সব কিছুই Modern Times-এর অক্টোপাসের কবলে পড়ে নিষ্পিষ্ট হয়ে গেল, সব

চলচ্চিত্র
ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ

মৃণাল সেন

সপ্তর্ষি প্রকাশন

হুলিউশন থেকে মুক্তি পেল আমাদের নায়ক—অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অমানিশা এনে দিল যন্ত্রসভ্যতার গৌরবে আত্মহারা Modern times। ব্যক্তির জীবনমুকুরে সমাজের যে-ছায়া চার্লি প্রতিফলিত করলেন তা অনেক শিল্পীর ঈর্ষার বস্তু হয়ে রয়েছে। অনাহার ও বেকারির জ্বালা এখনও পৃথিবীর অনেকাংশেই আছে। তাই Modern Times-এর modernity আজও ক্ষুণ্ণ হয়নি এতটুকু।

হাঁটতে হাঁটতে 'খুদে ভবঘুরে' এবার এল কারখানায়—মজুরের কাজ নিয়ে এসে দাঁড়াল দর্শকের সামনে। যথারীতি সমাদর পেয়েও কিন্তু এবার একটা নতুন ব্যাপার লক্ষ করা গেল—তা হল সমালোচক প্রতিক্রিয়ার রকমফের। কেউ বললেন—বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে যন্ত্রযুগের বাস্তব সমস্যার যথাযথ শিল্পায়ন হয়েছে ছবিটিতে, কেউ বা ছবিটিকে কমিউনিস্ট উগ্রতার জন্য বেমালুম নাকচ করে দিলেন, আবার কারও মতে উদ্দেশ্য যেমনই থাকুক না কেন—সমাজ সমস্যার বিশ্লেষণ বাস্তবানুগ হয়নি অর্থাৎ চ্যাপলিন নাকি এই ছবিতে যন্ত্রযুগকে ছোটো নজরে দেখেছেন। Europe-এর কোনও কোনও প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রীয় কর্তারা তো ছবিটিকে তাঁদের দেশে দেখানোই বন্ধ করে দিলেন।

সমস্ত উত্তেজনা, প্রতিক্রিয়া ও প্রচারের অভিযোগের মুখে চ্যাপলিন স্পষ্ট জবাব দিলেন:

> Nonsense! I was only poking fun at the general confusion from which we are all suffering. তিনি বললেন—The things I tried to say in this flim are very close to everyone. I know of a factory where the workers were fined if they went to the urinals too often. Everyone knows that there are salesman who have to maintain an incredible pace of salesmanship, continually driven by their horses and the ones with the lowest sales are automatically discharged, with no excuse accepted. You know about things. Then you must not object if I put them on screen and satirise them.

এরপর সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সভ্যতার সংকট যখন ক্রমেই পাকিয়ে উঠতে লাগল, ইউরোপের সারা তল্লাট জুড়ে যখন রাষ্ট্রীয় অরাজকতা ধূমায়িত হতে আরম্ভ করল তখন দেখা গেল বিদ্রূপ ছাড়িয়েও শিল্পী চ্যাপলিন আরও কিছু বলতে চান এবং নিজের ভেতর থেকে তাগিদটা এসেছিল বলেই Modern Times শেষ করেই 'খুদে ভবঘুরে' চার্লি সম্পর্কে চ্যাপলিন বললেন:

> In my new film he will not be quite so nice. I am sharpening the edge of his character so that people who have liked him vaguely will have to make up their minds.

সভ্যতার সে এক দারুণ দুর্যোগ। হিটলার, মুসোলিনি, ফ্রাঙ্কো আর তোজোতে মিলে এক অসভ্য উন্মত্ততা লাগিয়ে দিলেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে—চিনে, আবিসিনিয়ায়, ইউরোপে এবং সেই পশুশক্তির কাছে নতিস্বীকার করে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন কাপুরুষের মতো মিউনিখ চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়ে এলেন। এবং এই চূড়ান্ত ওলটপালটের মধ্যেই চার্লি চ্যাপলিন তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ভবঘুরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বললেন—I am sharpening the edge of his character। ১৯৪০ সালে চ্যাপলিন দর্শকের সামনে হাজির করলেন তাঁর নতুন ছবি The Great Dictator। শুধু ভবঘুরের চরিত্রচিত্রণেই নয়—চ্যাপলিন এবার আঙ্গিকের দিক থেকেও এক মস্ত পরিবর্তন আনলেন—সবাইকে তাক লাগিয়ে ছবিতে ভাষা জুড়লেন। চেতনার এই উন্নততর স্তরে পৌঁছে তিনি ছবিতে শব্দযোজনা সম্পর্কে তাঁর পুরোনো ধারণাকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিতে এতটুকু ইতস্তত করলেন না। সিনেমা-রসিকদের কেউ কেউ চ্যাপলিনের সমালোচনা করতে ছাড়লেন না। বিশেষ করে কাহিনির শেষে ছ'মিনিট ধরে ইহুদি নাপিতের একটানা গুরুগম্ভীর বক্তৃতা তাঁদের কাছে রীতিমতো বিসদৃশ ঠেকল। চ্যাপলিন আগে থেকেই এই ধরনের সমালোচনার জন্য তৈরি ছিলেন—আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন: 'In the new film he will not be quite nice. People who have liked him vaguely will have to make up their minds'. কিন্তু তবু এই বিরুদ্ধ সমালোচনার মুখে চ্যাপলিন চুপ করে রইলেন না। ছবিতে যা কিছু নতুনত্বের প্রবর্তন তিনি করলেন তা পুরোপুরি জেনেশুনেই করলেন। তাই তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এতদিন সবাইকে হাসিয়েছেন বলে আজ সভ্যতার এই দারুণ দুর্দিনে বক্তব্য প্রকাশের তাগিদে তাঁর কিছু শোনাবার অধিকার নেই! বহুদিনের সঞ্চিত জীবনের যত ব্যর্থতা, যত জ্বালা, যত তীব্রতা সমস্ত বুকে চেপে নিয়ে শিল্পী চ্যাপলিন উঠে দাঁড়ালেন বলতে—শোনাতে—সিনেমা শিল্পের দুটি প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতিয়ার নিয়ে—ছবি ও শব্দে। গত দুটি মহাযুদ্ধের ভেতরকার সময়ের মধ্যে কাহিনিকে বাঁধলেন—যে সময়টা চ্যাপলিনের ভাষায়—'অসভ্য উন্মত্ততায় জর্জরিত, স্বাধীনতা যখন কর্তিত, মানবতা যখন পদে পদে লাঞ্ছিত।'

প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রীয় কর্তাদের নানারকমের হুমকি ও চোখরাঙানির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চ্যাপলিন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে এই ছবির মধ্যে দিয়ে—

> I wanted to see the return of decency and kindness. I am not communist, just a human being who wants to see this country a real democracy and freedom from this internal regimentation which is crawling over the rest of the world.

আমেরিকায় ও বাইরে প্রতিক্রিয়াশীলের দল নানারকম প্রচারকার্য চালালেন চ্যাপলিনের বিরুদ্ধে—শেষ পর্যন্ত এঁটে উঠতে না পেরে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে পর্যন্ত টেনে নিয়ে এলেন পত্রপত্রিকায়, সভাসমিতিতে, গির্জায় গির্জায়।

কিন্তু চ্যাপলিনকে টলাতে কেউ পারল না। ১৯৪২ সালের নিউইয়র্কের এক সভায় তিনি বাণী পাঠালেন—রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে এবং কিছুদিন পরেই তিনি এক প্রকাশ্য সভায় ইউরোপের পশ্চিম সীমান্তে Second Front খোলার দাবি জানালেন। পরবর্তীকালে যখন Un-American Activities Committee-র কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর হুমকি দেওয়া হল তখন তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন—আমি কমিউনিস্ট নই, আমি শান্তিবাদী।

যুদ্ধ থামল, কিন্তু সাধারণ মানুষের জাবনে শান্তি এল না। শোষকের মাথায় গজিয়ে উঠল যুদ্ধের চক্রান্ত। আর একটা দানবীয় উন্মত্ততার লোভে যুদ্ধবাদীর দল উঠল নেচে। চ্যাপলিনের মনে খটকা লাগল; প্রচণ্ড নাড়া খেল তাঁর বিশ্বাস। Great Dictator-এর সেই ছাপোষা ইহুদি নাপিতের সুখস্বপ্ন গেল ভেঙে। সেই স্বপ্নের আন্দাজ দিয়েছিলেন চ্যাপলিন Great Dictator-এর শেষে ছ'-মিনিটের বক্তৃতায়:

> The clouds are lifting, the sun is breaking through, the soul of men has been given wings and at last he is beginning to fly...fly into the rainbow,... into the future... the future which belongs to you, to me, to all of us.

সীমাহীন ঘৃণায় চ্যাপলিনের মন বিষিয়ে উঠল—আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন M. Verdoux-কে—দ্বিধাহীন মনে তীব্র শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে অভিযোগ করলেন সমাজের এই দানবীয় অব্যবস্থাকে; সভ্যতার চরম বিকৃতিকে—বললেন, 'Mass killing! Does not the world encourage it?—I am an amateur in comparison.'

ভের্দু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হল। আদালত থেকে যখন তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন সে শুধু বলল: 'I shall see you all soon—very soon'.

মৃত্যুপথযাত্রী ভের্দুর মুখের সামনে তুলে ধরা হল একপাত্র মদ। ভের্দু প্রথমে ফিরিয়ে দিল, পরক্ষণেই বলে উঠল: 'Just a minute, I have never tasted rum!' এক চুমুকে সমস্তটা খেয়ে নিল ভের্দু, হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে পৃথিবীর হাওয়া বাতাস টেনে নিল বুক ভরে—তারপর চলল টুকটুক করে বধ্যভূমির দিকে—পেছনে পড়ে রইল শান্ত স্নিগ্ধ গ্রামীণ পরিবেশে ছিমছাম একটি বাড়িতে—তার পঙ্গু স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে।

এতদিন ভবঘুরে চার্লি বড়োলোকদের অনুকরণ করে এসেছে ছবিতে—তাদের কায়দায় সিগারেট ফুঁকেছে, সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সঙ্গে প্রেম করেছে, হাস্যাস্পদ হয়েছে এবং সমাজের ওপর তলার ভারী ভারী মূল্যবোধগুলোকেও হাস্যকর করে তুলেছে। কিন্তু M. Verdoux-তে সভ্যতার এই নিদারুণ দুর্যোগের মুখে জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোনও ব্যক্তিকে অনুকরণ না করে অনুকরণ করল একটা শ্রেণিকে। পুরোনো পোশাক ছেড়ে নতুন পোশাক সে পরল, চার্লি না হয়ে হল ভের্দু। সেই শ্রেণিকে অনুকরণ করে ছোটোখাটো ব্যাবসা ফেঁদে বসল সে—মানুষ মারার ব্যাবসা! সেই amateurish ব্যাবসা করতে গিয়ে ওই মানুষ মারার ব্যাপারটিকে রীতিমতো হাস্যকর করে তুলল ভের্দু। ঠিক যেমন সিগারেট ফোঁকা অথবা প্রেম নিবেদনের ব্যাপারগুলোকে হাস্যকর করে তোলা হয়েছিল। অর্থাৎ M. Verdoux চ্যাপলিনের সেই চিরপুরাতন ও চিরনবীন little tramp-এরই logical extension।

অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার সীমানা ডিঙিয়ে চ্যাপলিন আন্তর্জাতিক মানুষের ইতিহাসের গভীরে ঢুকে পড়লেন—শিল্পীর সমস্ত তীব্রতা, বেদনা আর উত্তাপ নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর সংখ্যা বাড়ল এ-কথা বলা চলে না, কিন্তু যা বাড়ল তা হল শত্রুর দাপট।

হামলে পড়লেন শত্রুরা, হুমড়ি খেয়ে পড়লেন চ্যাপলিনকে নিরস্ত্র করতে। নানা কায়দায় চ্যাপলিনকে ঘায়েল করার চেষ্টা চলল।

সীমাহীন ধৈর্য আর অচঞ্চল বিশ্বাস নিয়ে চ্যাপলিন উপেক্ষা করলেন সব কিছু। স্থির পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন যেমন চলা দরকার। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নতুন নাগিনিদের বিষাক্ত নিশ্বাস তিনি অনুভব করেছিলেন, তাই ১৯৪৭-এও তিনি শান্তির ললিতবাণী না শুনিয়ে উপহার দিলেন মঁসিয়ে ভের্দু। তারপর ১৯৫২ সালে—'Limelight'।

সৃষ্টির নতুন ঠিকানার সন্ধানে বেরুলেন, ব্যক্ত করলেন দু'টি মানবাত্মার হাসিকান্না আশা-নিরাশার ইতিবৃত্ত, পৃথিবীর পাঠশালায় জীবনপ্রেমের রূপ দিলেন 'লাইমলাইট'-এ। চ্যাপলিন জানালেন, 'In these days of hate and suspicion I have tried to tell something about human kindness'.

এক প্রৌঢ় ভাঁড়ের সঙ্গে এক তরুণী নর্তকীর পরিচয়, প্রণয় ও বিচিত্র সম্পর্কের কাহিনি রূপায়িত হল 'লাইমলাইট'-এ। দুটি মানুষ—ক্যালভেরো ও টেরি—জীবনযুদ্ধে হার মেনেছিল দু'জনেই—বেঁচে থাকার অসহ্য বিড়ম্বনায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত মৃতের শামিল হয়েছিল দু'জনেই। সেই ক্যালভেরো ও টেরির কাহিনি চ্যাপলিন জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে তুলে ধরলেন ছবির

পর্দায়। ক্যালভেরো মৃত্যুর হাত থেকে টেরিকে বাঁচালেন, টেরি ধীরে ধীরে জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা ফিরে পেল ক্যালভেরোর ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। এবং শেষ পর্যন্ত মঞ্চের প্রধানা নর্তকীরূপে প্রতিষ্ঠা পেল টেরি। দৃঢ় প্রত্যয় এল তার জীবনে, বিশ্বাস এল, এল মহত্ত্বের ইশারা। আর ক্যালভেরো নতুন করে জীবনকে চিনল—চিনল টেরির ওপর তার যৌবনোত্তর কালের বিলম্বিত প্রেমের ভেতর দিয়ে, বুঝল যে জীবন শুধু প্রহসন নয়: 'Life goes on and that is PROGRESS'.

Life goes on and that is PROGRESS। সেই জীবনের সঙ্গে, মানুষের সেই মহান ইতিহাসের সঙ্গে চ্যাপলিনও এগিয়ে চলেছেন। আজও। চ্যাপলিনের জীবন—সংগ্রামের জীবন মানবতার সুস্থ, সুন্দর বিকাশের দাবি নিয়ে এসেছেন তিনি। অন্তরে প্রৌঢ় ভাঁড় ক্যালভেরোর সেই মহৎ উপলব্ধি:

LIFE GOES ON AND THAT IS PROGRESS.

সে বেশ কিছুদিন আগেকার কথা, জীবনে প্রথম ছবি দেখছি। ছবির নাম 'কপালকুণ্ডলা', দেশের স্বদেশি মেলায় দেখানো হচ্ছে। বাড়ি থেকে অনুমতি পেয়ে আমরা দুজনে ছবি দেখতে গেলাম, আমি আর আমার দাদা। দুই ভাই, কিন্তু চরিত্রে কিছু ফারাক ছিল দু'জনের মধ্যে। আমার দাদাটি বেশ চটপটে, চালাক-চতুর, সব কিছুতেই একটা কিছু মন্তব্য করার বাতিক ছিল ওর। আর আমি, আত্মীয়স্বজনের মতে, কেমন যেন একটু সাদাসিধে, বোকা বোকা ছিলাম। যা হোক, ছবি দেখে বাড়ি ফিরছি। আমি অভিভূত, প্রথম ছবি দেখার বিস্ময়ে আবিষ্ট, হতবাক। দাদার দিকে তাকালাম। দাদা ভাবছে। চুপচাপ হাঁটছি দু'জনে। একসময়ে দাদাটি বলে উঠল, "জানিস, কলকাতা নয়তো, পর্দাটা বড্ড ছোটো।" বুঝতে পারলাম না দাদার কথাটা, জিজ্ঞাসার চোখে তাকালাম। দাদা বলল, বেশ খানিকটা ভারিক্কি চালে, "দেখিসনি, মাঝে মাঝে কাপালিকের শুধু খড়ম-পরা পা-জোড়া দেখা গেছে!"

অর্থাৎ বাকিটা কাটা পড়েছে। মফস্‌সলের পর্দা তো!

আমি ভাবলাম, হয়তো!

আর একটা ঘটনা। ঘটেছিল অনেকদিন পরে। তাও কয়েক বছর আগেকার কথা। ঘটনাটি ঘটেছিল চৌরঙ্গি আর এলগিন রোডের মোড়ে। একটা বাস ও একটা ট্রামের অ্যাক্সিডেন্ট—মুখোমুখি। বাসটা এসপ্ল্যানেডমুখী আর ট্রাম বালিগঞ্জগামী। অনেক যাত্রী জখম হয়েছিল, আমার এক বন্ধুও ছিলেন তাঁদের মধ্যে—বাসের প্রথম সারির যাত্রী। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমার বন্ধুটি সেই ঘটনার কথাই আমাকে একদিন বলেছিলেন। বলেছিলেন, "একটা মুহূর্তে... ট্রামের মাথায় সমস্ত আকাশ জুড়ে দেখলাম একটা লেখা... B-A-L-L-Y-G-U-N-G-E... আকাশপ্রমাণ... বিরাট...... বিশাল.... !"

তারপর—হাসপাতাল। জ্ঞান ফিরতে বন্ধু দেখলেন যে তিনি হাসপাতালে।

বলা বাহুল্য, লেখাটা যতটুকু থাকবার ততটুকু হয়েই ট্রামের মাথায় ঝুলছিল, অথচ বন্ধুর অভিজ্ঞতাটুকু অত্যন্ত বাস্তব। অর্থাৎ আমার বন্ধু যা দেখেছিলেন—জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে—তা খালি চোখের দেখা নয়—মনের চোখের। বস্তুরাজ্যের সীমানা ডিঙিয়ে সেই দেখা অনুভূতির রাজ্যের যার মধ্য দিয়ে অ্যাক্সিডেন্টের একটা ভয়ংকর চেহারা অসাধারণভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষেই এই চোখে দেখা সম্ভব। আমার ছোটোবেলার মন্তব্যবাগীশ দাদার পক্ষেও। আর সম্ভব সিনেমার পক্ষে—ক্যামেরার সাহায্যে—ক্যামেরার চোখে। এবং ক্যামেরার ধর্মই হচ্ছে এই—দৃশ্যবস্তুকে দরকারমতো ছোটো বড়ো করে দেখানো, প্রয়োজনমতো সাজিয়ে-গুছিয়ে উপস্থিত করা। ঠিক যেমন করেছিলেন 'কপালকুণ্ডলা'র পরিচালক শুধু খড়ম-পরা পা-জোড়া দেখিয়ে।

এই চোখে দেখার কথা রবীন্দ্রনাথও তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বলেছেন 'জীবনস্মৃতি'তে। একদিন সকালে সদর স্ট্রিটের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার লোকজন দেখতে দেখতে—তাঁরই ভাষায়:

> হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্ব-সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত।... শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।

অর্থাৎ দৃশ্যবস্তুর আবরণের আড়ালে একটা আত্মিক চেহারা প্রত্যক্ষ করলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং সেই দিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি তিনি লিখে ফেললেন।

সোভিয়েত চিত্র পরিচালক আইজেনস্তাইনও এই 'চৈতন্য' দিয়ে দেখার কথা বলে গেছেন সিনেমা প্রসঙ্গে। বলেছেন visual perception-এর মধ্য দিয়ে intellectual perception-এ পৌঁছোনোর কথা।

একটা অত্যন্ত আটপৌরে দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টাকে বুঝিয়েছেন আইজেনস্তাইন। ধরুন, একটা ঘড়ি। ঘড়ির দুটো কাঁটা ঘুরছে। একটা ছোটো ও আর একটা বড়ো কাঁটা। ধরা যাক ন'টা বাজল। খালি চোখে কী দেখতে পাচ্ছেন? দেখছেন, কাঁটা দুটো সেই মুহূর্তে একটা সমকোণ (Right angle) সৃষ্টি করে দাঁড়িয়েছে। শুধু এইটুকু, আর কিছু নয়। এবং সেইটুকু শুধু চোখেরই দেখা। কিন্তু এই চোখে দেখার মধ্য দিয়ে ন'টা বাজার মর্মার্থ আপনি ধরেছেন, এবং তা ধরেছেন আপনি আপনার চৈতন্য দিয়ে, আপনার intellectual perception দিয়ে—যা চোখে দেখা যায় না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। অর্থাৎ যা চাক্ষুস নয়, বোধের। এবং সেই

প্রথম ছবি দেখতে গিয়ে আমার দাদা একটু বাড়তি রকমের বিজ্ঞানবাগীশ হয়ে গিয়ে গোটা ছবিটা দেখেছিল নিতান্তই চাক্ষুস দৃষ্টি দিয়ে, কাপালিকের খড়ম-পরা পা-জোড়াই শুধু দেখেছিল, ওই দৃশ্যবস্তুটির মধ্য দিয়ে কাপালিকের দাপটটাকে ঠিক ঠাহর করতে পারেনি। অর্থাৎ একেবারে প্রাথমিক স্তরের intellectual preception-ও হারিয়ে ফেলেছিল।

কিন্তু আমার বন্ধু চৈতন্য হারানোরই ঠিক আগের মুহূর্তে খালি চোখে না দেখে লেখাটিকে দেখেছিলেন চৈতন্য দিয়ে, visual preception ডিঙিয়ে পৌঁছেছিলেন intellectual preception-এর রাজ্যে—অ্যাক্সিডেন্টের এক ভয়াবহ ছবি যা চোখে-দেখা নয় তাই যেন উপস্থিত করলেন একটা শারীরিক স্পষ্টতা নিয়ে—ওঁর ওই উক্তির মধ্যে।

সিনেমার আঙ্গিকের বিশিষ্টতা এইখানেই—ক্যামেরায় যা দেখা যায় এবং শব্দযন্ত্রে যা শোনা যায় তারই প্রয়োগনৈপুণ্য দেখাশোনা ধরা-ছোঁয়ার আড়ালে বাঞ্ছিত এক অনুভূতি সৃষ্টি visual এবং aural perception-এর মধ্য দিয়ে একটা intellectual perception-এ পৌঁছোনো—বস্তুগ্রাহ্য কয়েকটি ছোটো-বড়ো ছবি ও কমানো-বাড়ানো শব্দের মধ্য দিয়ে ট্রাম-বাস অ্যাক্সিডেন্টের একটা ভয়াবহতায় এসে দাঁড়ানো। অর্থাৎ চৈতন্য দিয়ে দেখা যার অস্তিত্ব শুধু মনের রাজ্যে।

যেমন কবিতায় হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য টুকিটাকির মধ্য দিয়ে, চিত্রকল্পের সুষ্ঠু প্রয়োগ মারফত এক আত্মিক আবহাওয়া তৈরি করা। কবিতায় তা বইয়ের পাতার আক্ষরিকতায় সীমাবদ্ধ, আর সিনেমার ক্ষেত্রে তা আরও খানিকটা স্পষ্টতা, খানিকটা শারীরিকতার সম্ভাবনা নিয়ে পর্দায় ছড়ানো। কবিতার পাঠক যেমন তাঁর বুদ্ধি খাটিয়ে, তাঁর সৃজনী শক্তি দিয়ে, তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে বইয়ের পাতার সেই আক্ষরিকতার আড়ালে আত্মিক আবহাওয়াটির আমেজ পেয়ে থাকেন, ঠিক তেমনি সিনেমার দর্শকও তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে ছবি ও শব্দের সীমানা পেরিয়ে 'চৈতন্য'র রাজ্যে প্রবেশ করেন।

সিনেমার ভাষায় একেই আমরা বলে থাকি মন্টাজ—একাধিক ছবি ও শব্দের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে দর্শককে নতুন এক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া -যে-স্তর পুরোপুরিভাবে বোধের, উপলব্ধির, ধরা-ছোঁয়া ও দেখাশোনার বাইরে, যা আলাদাভাবে সেইসব ছবি বা শব্দের কোনওটিতে উপস্থিত নয়। এবং যা অতি প্রাচীনকাল থেকেই চীনা ভাষায় hieroglyphs-এর মধ্যে বিস্ময়করভাবে স্পষ্ট।

যেমন ধরুন, আড়িপাতা। কথাটা লিখতে গিয়ে চিনা ভাষায় দুটো প্রতীকী ছবি ব্যবহার করা হয়ে থাকে—একটা কান ও একটা দরজা। অথচ কান বা

দরজা কোনওটিই আলাদাভাবে আড়ি পাতার এতটুকু অর্থ বহন করছে না, শুধুমাত্র দুটো ছবির প্রয়োগেই কান বা দরজা-নিরপেক্ষ একটা অর্থের উৎপত্তি ঘটছে—যে অর্থটি বোধের, উপলব্ধির, ধরা-ছোঁয়া দেখাশোনার বাইরে, চোখে দেখা দুটো প্রতীকী ছবির মধ্য দিয়ে চৈতন্য দিয়ে দেখা একটা অর্থ—আড়ি পাতা।

অথবা ধরুন—কাঁদা—একটা চোখ ও একফোঁটা জল। অথবা সাংসারিক শান্তি—একটা চালাঘর ও তার নীচে একটা নারী। অর্থাৎ concubine-বিবর্জিত চিনা সংসার। অর্থ, শান্তি। আলাদাভাবে কোনওটিই বাঞ্ছিত অর্থ বহন করছে না, অর্থের উৎপত্তি ঘটছে সমন্বিত প্রয়োগের ফলেই।

চিনা ভাষায় hieroglyphs-এর মারফত প্রাচীনকাল থেকে যা হয়ে আসছে, সিনেমার ভাষায় সেইটিকেই আমরা বলে থাকি মন্টাজ—আমাদের দেশে সিনেমা মহলে যে-কথাটার অপপ্রয়োগ ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে অসহ্য অন্যায়ভাবে।

সিনেমার আঙ্গিকের মূল ব্যাপারটাই হচ্ছে এই—মন্টাজ। শুধু সিনেমা কেন, সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত আর্ট ফর্মের মধ্যেই আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এই মন্টাজ-এরই প্রকাশ ঘটেছে নানাভাবে, নানা কায়দায়, নানা ঢঙে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মধ্য দিয়ে এক 'অতীন্দ্রিয়' অনুভূতির স্তরে পৌঁছোনোর প্রয়োগ-পদ্ধতি। বিশেষ করে, কবিতার অনুরাগীরা জানেন, প্রক্রিয়াটি কবিতার ক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে প্রযোজ্য।

সিনেমার বিজ্ঞানের অ-আ-ক-খ-র খবর যাঁরা রাখেন, একটু ভাবলে তাঁরাও দেখতে পাবেন যে চলচ্চিত্রের যান্ত্রিকতার মধ্যেও রয়েছে ওই একই প্রক্রিয়া—মন্টাজ। কারণ চলচ্চিত্র আর কিছুই নয়, অসংখ্য স্থিরচিত্রের সমাবেশমাত্র। সেই স্থিরচিত্রগুলি পরপর পর্দায় পড়ছে এবং আপনি তাই দেখতে পাচ্ছেন একটার পর একটা—এক সেকেন্ডে চব্বিশটি স্থিরচিত্র আপনি দেখছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে গতির একটা illusion আপনি পাচ্ছেন আপনার মনে, চৈতন্য বা intellectual perception দিয়ে শারীরিক স্পষ্টতা নিয়ে গতির একটা আইডিয়া আপনি তৈরি করে নিচ্ছেন আপনার অনুভূতির রাজ্যে, আলাদাভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের ফিতেয় যে-গতি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মন্টাজের এক অতি সহজ ও স্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

সিনেমার আঙ্গিকে এবং যান্ত্রিকতার ক্ষেত্রে এই মন্টাজকেই সিনেমা-রাজ্যের বাইরে বলা হয়ে থাকে ডায়ালেকটিক্স (Dialectics), যে-কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ হয়তো খানিকটা 'উগ্র' রাজনীতির আঁচ পেয়ে কিঞ্চিৎ আশঙ্কিত হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক, কারণ কথাটি দর্শনশাস্ত্রজাত এবং এইটিকে আমাকে আমদানি করতে হচ্ছে আমার বক্তব্য

প্রকাশেরই তাগিদে। ডায়ালেকটিক্স—দুই বা ততোধিক বস্তু বা অবস্থার বিরোধের মধ্য দিয়ে তৃতীয় অবস্থায় উন্নীত হওয়ার প্রক্রিয়া। অর্থাৎ মন্টাজ।

বিশ্বচরাচরের সমস্ত কিছুতেই এই ডায়ালেকটিক্স ঘটছে। ঘটতেই হবে। এবং সিনেমার যান্ত্রিকতা বা আঙ্গিকেই শুধু নয়, একটা পুরো ছবি গড়ে তোলার প্রতিটি পর্যায়েই ডায়ালেকটিক্স বর্তমান। ঘটনার বিন্যাসে, চরিত্র-সৃষ্টিতে, নাটকের গঠন পদ্ধতিতে—সর্বত্রই ডায়ালেকটিক্স ঘটে চলেছে পারস্পরিক সংঘর্ষ বা অন্তর্বিরোধ ও নতুন অবস্থায় উন্নীত হওয়ার মধ্য দিয়ে। নাটক সার্থকতায় পৌঁছোয় বিরোধের মধ্য দিয়ে, চরিত্রের স্পষ্টতাও অন্তর্বিরোধের মাধ্যমেই ঘটে থাকে আর ঘটনার বাস্তবতাও পুরোমাত্রায় নির্ভরশীল বিরোধী অস্তিত্বের সংঘর্ষের ভেতরেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ছবি করতে গিয়ে ডায়ালেকটিক্স বা মন্টাজকে কতখানি ব্যবহার করতে পারছি আমরা—ছবির কারবারিরা। পারছি বইকি। যান্ত্রিকতার ক্ষেত্রে তো ডায়ালেকটিক্স বা মন্টাজ ঘটছেই বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মে। আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও এবং ঘটনা, চরিত্র ও নাটক সৃষ্টিতেও—জ্ঞানেই হোক অথবা অজ্ঞানেই হোক—এই প্রক্রিয়াটি আমাদের কার্যক্রমের মধ্যে ছোটো বড়ো হয়ে অবশ্যই ঘটছে। এবং আমাদেরই মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান, যাঁরা যথার্থই শিল্পী, যাঁদের মধ্যে চিন্তার ও ভাবের গভীরতার আন্দাজ পাই তাঁরাই আবার এই প্রক্রিয়াটির সুষ্ঠু ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এক আশ্চর্য সার্থক শিল্পসৃষ্টিতে সক্ষম হচ্ছেন। বিশেষ করে আজকের দিনে একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠীর শিল্পকর্মের মধ্যে এই জিনিসটি অনেক বেশি সুন্দর, সার্থক ও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে-ডায়ালেকটিক্স আমাদের সিনেমায় তথা সমস্ত শিল্পসত্তায় এমনিভাবে পরিব্যাপ্ত, সামগ্রিকভাবে আমাদের ছবির কারবারিদের সমাজ-চিন্তায় সেই ডায়ালেকটিক্স-এর দৃষ্টি প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। মাত্র গুটিকয়েক শিল্পীর শিল্পকর্মে এই দৃষ্টির আন্দাজ পাই, খুঁজে পাই সমাজকে ও পারিপার্শ্বিককে ডায়ালেকটিক্স-এর সৃষ্টি দিয়ে অথবা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চৈতন্য' দিয়ে দেখবার মতো নিষ্ঠাবান মন। এবং তারই মধ্য দিয়ে পাই সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের অন্তর্নিহিত ছোটো বড়ো বিরোধগুলি—স্ব-বিরোধী ও পরস্পর-বিরোধী—আর ইশারা নতুন একটি স্তরের—নতুন ও বলিষ্ঠ এক সমাজনীতি অঙ্কুরিত হচ্ছে যেখানে এবং যা সমাজবিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মেই অনিবার্যভাবে ঘটছে, ঘটেছে এবং ঘটবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা লক্ষ করছি তা হচ্ছে ডায়ালেকটিক্স-এর দৃষ্টির একান্ত অভাব, চৈতন্যর দীনতা—যার ফলে আঙ্গিকের সফলতা ও নাটকের নাট্যগুণ সমৃদ্ধি সত্ত্বেও সামগ্রিক ক্ষেত্রে ছবিগুলো হয়ে

দাঁড়াচ্ছে হাস্যকরভাবে অবাস্তব, মৃত, মিথ্যাচারের রাংতায় মোড়া এবং নিঃসন্দেহে সমাজ-বিরোধী। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের অনিবার্যতার পরিপন্থী।

এঁরা পিছিয়ে পড়ার দল, যাঁরা সমাজকে পিছন থেকে টানছেন, যাঁরা তাঁদের অক্ষমতা, অজ্ঞানতা ও সংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়ে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পেরে চরম বিরোধিতা করছেন সমাজসচেতন গুটিকয়েক শিল্পীর সঙ্গে। এঁদের বিরোধ উন্নততর সামাজিক চেতনার সঙ্গে, সমাজের নতুনতম ধ্যানের সঙ্গে এঁরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের মহান আন্দোলনের ধার ধারেন না, এবং অতি সহজেই এঁরা যুদ্ধোত্তর যুগের মহত্তম অবদান গভীর জীবনবাদে অনুপ্রাণিত 'নিরিয়ালিজ্‌ম্'কে নাকচ করে দিতে চাইছেন, ঠিক যেমন করে আমার ছেলেবেলাকার দাদা আমাদের দেশের স্বদেশি মেলায় দেখানো ছবির পর্দাকে নাকচ করে দিয়েছিল। অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের চৈতন্যও না থাকার দরুন আমার দাদাটি যেমন কাপালিকের পা-জোড়াকে পায়ের সীমানাতেই আটকে রেখেছিল সে দিন, এঁরাও তেমনি উন্নততর সামাজিক চৈতন্যর অভাবে নতুন ধারার মধ্যে মহত্ত্বের ইশারা পাচ্ছেন না। এই তো সে দিনও কলকাতার এক দৈনিক পত্রিকায় পড়েছি, আমাদেরই মধ্যেকার একজন খ্যাতিমান চিত্রপরিচালক বলেছেন, 'নিয়োরিয়ালিজ্‌ম্' নাকি যুদ্ধোত্তর যুগের প্রচণ্ড হতাশার প্রতিফলন। কথাটা নিঃসন্দেহে ভদ্রলোকের অসামান্য মূর্খতারই পরিচায়ক। এবং সর্বোপরি এঁরা দোহাই পাড়ছেন ব্যাবসার। কিন্তু এই ব্যাবসার দোহাই পেড়ে আগাথা ক্রিস্টিকে টমাস মান-এর ওপর তুলে ধরার চেষ্টা যেমন হাস্যকরভাবে করুণ, ঠিক তেমনি সিনেমার ক্ষেত্রেও এঁদের এই দোহাই নিতান্তই দুর্বল ও ব্যর্থ। সাময়িকভাবে হোঁচট খাবেন হয়তো, তবু এই সচেতন দলটি কিছুতেই বাতিল হয়ে যাবেন না কারণ সামাজিক চেতনা এঁদের এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে, দিয়েছে অপ্রতিহত শক্তি ও গতি।

এবং সভ্যতার ইতিহাস বলছে, চৈতন্যর জয় অনিবার্যভাবেই সত্য।

প্রশ্নোত্তর : ১

প্রশ্ন: সাহিত্য, কবিতা, চিত্র, সংগীত, রাজনীতি এবং যন্ত্রবিজ্ঞানের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক কী?

উত্তর: একটা ধারণা আমাদের অনেককেই পেয়ে বসেছে যা থেকে আমরা অনেকেই মনে করে থাকি যে এক শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে অন্য এক শিল্পমাধ্যমের কোনও সম্পর্ক নেই! এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অহি-নকুলের সম্পর্ক! অনেকটা শরিকি বিবাদের পর্যায়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করে থাকি আমরা অনেকেই। এই ধরনের ভাবনা, অন্তত আমি তাই মনে করি, মোটেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। নিতান্তই ব্যবহারিক কারণে কিঞ্চিৎধিক স্বাতন্ত্র্য যতটুকু থাকবার তা তো রয়েছেই। এবং সেই স্বাতন্ত্র্য এক একটি শিল্পমাধ্যমের বহিরঙ্গে সীমাবদ্ধ। যেমন ধরুন: গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ। কাগজের গায়ে ছাপার অক্ষরে তা বিধৃত। চিত্রকলা বিধৃত রঙে, তেলে বা জলে, তুলিতে। চলচ্চিত্র অধিষ্ঠিত সেলুলয়েডের গায়ে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। কিন্তু বহিরঙ্গের এ-হেন স্বাতন্ত্র্যের আড়ালে যে আত্মিক চেহারার আন্দাজ পাই তাতে তফাত কতটুকু? এবং আদৌ পাই কি? আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি, তফাত নেই, বরং সম্পর্ক গভীর। এবং যতই দিন যাচ্ছে, যতই পরীক্ষানিরীক্ষা বাড়ছে, সম্পর্ক ততই গভীরতর হচ্ছে। বিশ্ব চলচ্চিত্রের দরবারে আজ তাই দেখতে পাই হঠাৎ কোত্থেকে এক সাংবাদিক বা কবি এসে ছবি তৈরি করছেন এবং হঠাৎ এক ছবি-করিয়ে কবিতা লিখছেন অথবা সাংবাদিকতায় পারদর্শী হয়ে উঠছেন। অর্থাৎ Crossfertilization-এর দারুণ এক চেষ্টা আজ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে বিশ্ব চলচ্চিত্রের আসরে। নিঃসন্দেহে এ অত্যন্ত আশার কথা। প্রতিটি শিল্পমাধ্যমের এগিয়ে যাওয়ার পথ এই কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অনেক প্রশস্ত হচ্ছে।

রাজনীতি? রাজনীতির সঙ্গে সমাজজীবনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আর তাই শিল্পকর্ম অর্থাৎ যা সর্বক্ষেত্রেই কমবেশি মাত্রায় সমাজজীবনেরই প্রতিফলন—

রাজনীতির আঁচ বাঁচিয়ে চলা তার পক্ষে কি সম্ভব? সোজাসুজি অথবা পরোক্ষ যেভাবেই হোক না কেন, রাজনীতির সঙ্গে শিল্পকর্মের যোগাযোগ অনস্বীকার্য।

তবে, হ্যাঁ, রাজনীতি শব্দটিকে এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার প্রয়োজন অনুভব করি। দার্শনিক অর্থে একে দেখার প্রয়োজন আছে, দৈনন্দিন ব্যাবহারিক প্রয়োগকর্মের মধ্য দিয়ে নয়।

যন্ত্রবিজ্ঞানের কথা তুলেছেন। চলচ্চিত্র যেহেতু বহুলাংশে যন্ত্রনির্ভর, বিজ্ঞানের অগ্রগতির তালে তাল রেখে তাই চলচ্চিত্রের গঠন-পদ্ধতিরও বিবর্তন হতে বাধ্য। রক্ষণশীলেরা এ-ক্ষেত্রে সময়ে-অসময়ে নানা প্রশ্ন তুলে থাকেন, নানা তর্ক তোলেন। কিন্তু প্রশ্ন ও তর্কের তোয়াক্কা না করে বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রও এগিয়ে চলেছে সরবে, প্রচণ্ড দাপটে।

প্রশ্ন: আধুনিক বাংলা সাহিত্যে চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা কত দূর? অবশ্য জীবনভিত্তিক সাহিত্যই এখানে উল্লেখ্য।

উত্তর: ছিটিয়ে-ছড়িয়ে ইদানীং যতটুকু লেখাপড়া করার সুযোগ ঘটেছে তা থেকে একটা কথা আমি যথেষ্ট জোর দিয়েই বলতে পারি যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান। লেখক গোষ্ঠীর একটি অংশের মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছি যে তাঁরা সেন্টিমেন্টকে সরাসরি বিসর্জন দেওয়ার কাজে সচেতন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা মস্ত কথা, বাঙালি মানসিকতার জগতে এ রীতিমতো একটি ছোটোখাটো বিপ্লব। বাংলা চলচ্চিত্র এ থেকে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। করতে পারলে আমাদের চলচ্চিত্রের গৌরব বাড়বে।

প্রশ্ন: কোন প্রদেশের সাহিত্য এদিক থেকে সব থেকে বেশি এগিয়ে?

উত্তর: বাংলা ছাড়া অন্য ভারতীয় ভাষা জানি না। বাংলায় অথবা ইংরেজিতে অনুবাদও বড়ো একটা চোখে পড়ে না। তাই, আপনাদের এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে, আক্ষরিক অর্থে হয়তো আধুনিক নয়, প্রাক্-যুদ্ধ যুগের দু'জন অসাধারণ লেখকের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে:

বাংলার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও হিন্দি সাহিত্যের মুনশি প্রেমচাঁদ। সেন্টিমেন্ট ও রোমান্টিকতাকে বিসর্জন দিয়ে অসামান্য শিল্প সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন যে ক'জন ভারতীয় মনীষী, তাঁদের মধ্যে এঁদের নাম নিঃসন্দেহে প্রথম সারিতে।

প্রশ্ন: ভারতে সর্বাধিক চলচ্চিত্র তৈরি হয়। বস্তুগত দিক থেকে এর তাৎপর্য কতটা?

উত্তর: ভয়াবহ। ভয়াবহ, কেননা অধিকাংশ ভারতীয় ছবিই কোনও দিক থেকেই কোনওরকম মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য নয়।

প্রশ্ন: বিদেশিদের চোখে অতি সাম্প্রতিক ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা কী?

উত্তর: আমরা এ-দেশে থেকে যা মনে করি, অর্থাৎ অধিকাংশ ভারতীয় ছবিই অতি নিচু মানের, বিদেশিরাও না দেখেই মোটামুটি তাই মনে করেন। সমস্ত দেশ থেকে বেছেবুছে কিছু কিছু ছবি যা বাইরে দেখানো হয়ে থাকে, সেইসব ভারতীয় ছবি সম্পর্কে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা মোটামুটি ভালো। এ-ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যক্তির রুচি পছন্দ-অপছন্দর প্রশ্ন এসে পড়ে। আমার কাছে যে ছবিটি খুব উঁচু দরের মনে হয়েছে, আপনার কাছে সেরকমটি মনে হবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। বিচারের তারতম্য থাকবেই থাকবে, কেননা বিচার যন্ত্রের মাধ্যমে হয় না, হয়ে থাকে ব্যক্তির মানসিক গড়নের ভিত্তিতে। তাই কিছু কিছু ভারতীয় চলচ্চিত্রকার সম্পর্কে বিদেশি অভিজ্ঞ মহলে তর্ক চলছে এরকম দেখেছি, দেখেছি দ্বিমত রয়েছে। এ থাকবেই। অর্থাৎ আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের জঙ্গলের মধ্যেও আন্তর্জাতিক আসরে জায়গা করে নেওয়ার মতো কিছু কিছু ঘটনা অতীতে ঘটেছে, বর্তমানে ঘটেছে ও ভবিষ্যতে ঘটবে এবং হয়তো এইসব ঘটনা একদিন বড়ো রকমের আন্দোলনের শামিল হবে— এই সত্যটি বিদেশের অভিজ্ঞ মহল আজ পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

প্রশ্ন: ভারতীয় সংগীতকে যেমন অতি সহজেই পাশ্চাত্য সংগীত থেকে পৃথক করা যায়, ভারতীয় চলচ্চিত্রের কি তেমন নিজস্বতা আছে?

উত্তর: "পৃথকীকরণ" সম্পর্কে আমার কিছু প্রশ্ন আছে, "নিজস্বতা" সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, কিঞ্চিতধিক ভয় আছে স্বাতন্ত্র্যের জন্যে মুখিয়ে ওঠার চেষ্টায়।

এ নিয়ে ভবিষ্যতে প্রবন্ধাকারে কিছু বক্তব্য পেশ করার ইচ্ছে আছে। এবং কিছু প্রশ্নও।

সপ্তর্ষি প্রকাশ | জানুয়ারি ২০১৩

গ্রন্থস্বত্ব | লেখক

প্রচ্ছদ | সৌরিশ মিত্র

প্রকাশন সম্পাদক | সুমিতা সামন্ত

শব্দগ্রন্থন | গ্রাফিক্স ৯৪৩২৩১৮৮১৫
প্রকাশক | স্বাতী রায়চৌধুরী
সপ্তর্ষি প্রকাশন
৫১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক | সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র | ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট। কলকাতা ০৯
যোগাযোগ | চলভাষ ৯৮৩০৩ ৭১৪৬৭
ই-মেল saptarshiprakashan@hotmail.com
ওয়েবসাইট www.saptarshiprakashan.com

সপ্তর্ষি-র বই পাবেন | দে'জ, দে বুক স্টোর, বুক ফ্রেন্ড, নব গ্রন্থ কুটির
চক্রবর্তী অ্যান্ড চ্যাটার্জি, বলাকা (কলেজ স্ট্রিট)
বুকস, সেন্ট্রাল বুক হাউস (শিলিগুড়ি),
পুস্তকমহল (ভুবনডাঙা, শান্তিনিকেতন)
মুক্তধারা (গোলমার্কেট, নিউ দিল্লি-১)

দাম | ১০০ টাকা

প্রকাশকের তরফে

দীর্ঘ সময় পরে বইটি পুনঃপ্রকাশিত হল। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭। গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

বর্তমান প্রকাশে এটি দুটি ভাগে বিন্যস্ত হল। প্রথম ভাগে প্রবন্ধ। দ্বিতীয় ভাগে রইল সাক্ষাৎকারগুলি। সেইসঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত হল পরিচালক তথা লেখকের কয়েকটি আলোকচিত্র। আলোকচিত্রী: সুভাষ নন্দী।

এই পুনঃপ্রকাশে বিশেষ সহায়ক ছিলেন শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায়, তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রশ্নোত্তর : ২

প্রশ্ন: আমরা লোকমুখে শুনেছি, আর সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপন মারফতও জানলুম, 'কলকাতা ৭১' বিদেশি সমঝদারদের তারিফ পেয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রগল্‌ভ দিশি খবরের কাগজ এ-বিষয়ে মোটামুটি মৌন; আমাদের তারস্বর বেতারও এ-সম্পর্কে নির্বাক। এই অপূর্ব নীরবতার কারণ কি? ভেনিসে ঠিক কি রকম সম্মান পেল আপনার ছবি? 'কলকাতা ৭১'-এর কোন কোন দিক বিদেশিদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে বলে মনে হয়? এ-সব প্রশ্নের জবাবে নিজের কথা বলতে হবে বলে সংকোচ বোধ করবেন না; কারণ নৈহাটি সিনে ক্লাবের সদস্যরা আপনার নিজেই কথাই শুনতে উৎসুক।

উত্তর: ছবির যাবতীয় বিজ্ঞাপন করা হয়ে থাকে প্রযোজকের পয়সায়। স্বভাবতই বিজ্ঞাপনে প্রশংসার অংশটুকুই আপনারা পাবেন। নিন্দার অংশ সযত্নে সরিয়ে রাখা হয়, আপনারা তা দেখতে পাবেন না। এবং ছবির পরিচালক প্রযোজক পরিবেশকের সঙ্গে যে সমস্ত কাগজওয়ালাদের মোটামুটি সদ্ভাব রয়েছে, সে সমস্ত কাগজের সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকরাই নানাভাবে ছবিটির প্রচারকার্য চালিয়ে থাকেন। কাগজওয়ালারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তা করে থাকেন। বড়ো কাগুজে সাংবাদিকদের অনেকের সঙ্গেই আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কমবেশি অস্বস্তিকর। ফলে, ওই ফ্রন্টে আমার তেমন কিছু হবে এমন মনে করবার কোনও কারণ নেই। আর বেতার? বেতার কি সর্বদাই সর্বক্ষেত্রে মুখর? এবং এ-ক্ষেত্রে, কলকাতা ৭১-এর ক্ষেত্রে, বেতারের নীরবতার কথা যা বলছেন, তার পেছনে কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে বলে আমি মনে করি না।

'কলকাতা ৭১' ভেনিসে এবং পরে জার্মানির ম্যানহাইম-এ, সুইজারল্যান্ডের নিঁয়তে এবং পশ্চিম বার্লিন-এ কমবেশি সমাদর পেয়েছে। ভেনিসের চেয়ে ম্যানহাইম-এ, নিঁয়-তে এবং বার্লিন-এ অনেক বেশি খাতির পেয়েছে। কিন্তু নিন্দিতও হয়েছে কোনও কোনও মহলে। সব মিলিয়ে হিসেবে যা দাঁড়ায়, তাতে দেখা যায় প্রশংসার ভাগ বেশি। হ্যাঁ, বেশিই। ভেনিসে লক্ষ করেছি ইংরেজ সমালোচকরা ছবিটিকে রীতিমতো অপছন্দ করেছেন। তাতে প্রথমে কিঞ্চিৎ দমে গিয়েছিলাম। পরে অবশ্য

নানা কথা মাথায় আসতে নিজেকে সামলে নিয়েছি এবং একদা ইংরেজ প্রভুদের 'বংশধর'-দের উদ্দেশে কিঞ্চিৎঅধিক বিষোদ্গারও করেছি। নিয়ঁ-তে অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য চেহারা দেখেছি। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের এক দিকপাল একজন খাঁটি ইংরেজ ছবিটি নিয়ে এতই উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন যে ভিড়ের মধ্যে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। নিয়ঁতে আরও কয়েকজন সমঝদার ইংরেজের নির্ভেজাল প্রশস্তি শুনেছি। বার্লিনে যাইনি। শুনেছি খুব জমজমাট প্রতিক্রিয়া সেখানেও। তবে হ্যাঁ, নিয়ঁ-তে এবং বার্লিন-এ কয়েকজন ভারতীয় খুবই রুষ্ট হয়েছিলেন ছবিটি দেখে, দারিদ্র্যের এ-হেন কদর্যতা ওখানকার গুটিকয়েক প্রতিপত্তিশীল ভারত-সন্তানদের যৎপরোনাস্তি পীড়িত করেছিল। গ্ল্যামার-লাঞ্ছিত দারিদ্র্যে অবশ্যই ভদ্রলোকদের কোনও আপত্তি থাকত না, কপট ক্রন্দনে অবশ্যই কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্নই বা অবশ হয়ে থাকতেন ওঁরা। কিন্তু যে দারিদ্র্যের উত্তরণ ঘটে ক্রোধে, সেই দারিদ্র্যচিত্র তাঁদের মানসিকতায় মহাপাপ বলে গণ্য এবং সেই দারিদ্র্য-দর্শনে তাঁদের বড়োই লজ্জা।

'কলকাতা ৭' যাঁদের ভালো লেগেছে ভেনিস, ম্যানহাইম-এ, নিয়ঁতে ও বার্লিন-এ তাঁদের কারও কারও সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা হয়েছে, কারও লেখাও বা পড়েছি। নানা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁরা ছবিটি দেখেছেন, নানাভাবে তাঁরা ছবিটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে তাঁদের ভালো লেগেছে:

(১) বক্তব্য: তাঁদের মতে, আমাদের দেশের বাস্তবতা ছবিতে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় উপস্থাপিত হয়েছে। এ-হেন উপস্থাপন তাঁদের মতে বৈজ্ঞানিক মনেরই পরিচায়ক। তাঁরা খুশি, বাস্তবতার এ-জাতীয় চিত্রণে।

(২) পরিবেশন রীতি: অনেকেরই মতে এ-ধরনের পরিবেশন—যা 'কলকাতা ৭১'-এ হয়েছে, ভারতীয় ছবিতে তাঁরা আগে দেখেননি। প্রচলিত রীতি থেকে ফর্মের এই মুক্তি প্রাপ্তি, তাঁদের মতে, ভারতীয় ছবিতে এই প্রথম।

(৩) রাজনৈতিক চেতনা: অনেকের ধারণা, 'কলকাতা ৭১'-এর পরিচালকের মানসিকতায় রাজনৈতিক চেতনা সদাজাগ্রত। প্রাচ্যের সিনেমার ইতিহাসে এ একটি বড়ো ঘটনা, তাঁরা মনে করেন।

কথায় কথায় আমি যখন তাঁদের বলি যে শিল্পকর্মীকে আজ প্রতিনিয়ত ঘটনার চাপে খানিকটা social anthropologist-এর ভূমিকা নিতে হবে, তখন তাঁরা আমার সঙ্গে পুরোপুরি একমত হন।

অন্যদিকে, ভেনিসে ছবি দেখে বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক John Coleman বলেন: blatant, crude and...(মনে নেই, কী যেন একটা খারাপ কথা লিখেছিলেন।) কেউ বলেছেন অসহ্য, কেউ বা বলেছেন বিরক্তিকর। কেউ মন্তব্য করেছেন, হাই তুলতে ইচ্ছে করে। ইত্যাদি।

প্রশ্ন: আপনার ছবি দেখে বিদেশি দর্শক আর দেশি দর্শকদের প্রতিক্রিয়ায় কোনও তফাত দেখেছেন? একই জিনিস কি সব দেশের দর্শকদের নাড়া দেয়? একইভাবে?

উত্তর: কী বলব? আমার বিচারবুদ্ধিতে তো একভাবেই নাড়া দেওয়া উচিত। তফাত যা হয় তা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে যেমন হয়ে থাকে। 'কলকাতা ৭১'-এর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, শুধু একটি বিশেষ অধ্যায় ছাড়া। ১৯৪৩-এর অধ্যায়, 'অঙ্গার'-এর চিত্ররূপ যেখানে। বস্তির বৃষ্টি (১৯৩৩) এবং ট্রেনের ছেলেরা (১৯৫৩) —এই দুইটি অধ্যায় সম্পর্কে বিদেশের প্রায় সবাই উচ্ছ্বসিত, কিন্তু 'অঙ্গার' সম্পর্কে কেমন যেন ঠান্ডা। বলে, ভালো। ওইটুকুই, ব্যস। দু' চারজনকে আমি জিজ্ঞাসাও করেছি, সদুত্তর তেমন একটা পাইনি। আলোচনায় টেনে এনে দেখেছি যে সমস্যার গুরুত্ব তাঁরা বুঝতে পারছেন ঠিক, তবু মনে হয়েছে কেমন যেন আলগা ভাব। এমনও কি হতে পারে যে বিষয়টি তাঁদের কাছে তেমন একটা বড়ো ব্যাপার নয়? তা মনে হয় না, একেবারেই না। মহিলাদের মধ্যে এমন অনেককে দেখেছি যাঁরা বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন, নানা প্রশ্ন করেছেন আমাকে, বিশেষ করে নিয়ঁ-তে। কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে বলতে বাধ্য হব যে অন্যান্য অধ্যায় সম্পর্কে বিদেশিদের যতখানি involved হতে দেখেছি, ১৯৪৩-এর ঘটনা সম্পর্কে ততখানি involve তাঁরা হতে পারেননি। হয়তো হতে পারে সংলাপের ভেতরে তাঁদের অনেকেই ঢুকতে অসুবিধে হয়েছে, হয়তো ফরাসি অনুবাদ (ছবিটিতে সাবটাইটেল ছিল ফরাসি ভাষায়) যে-রকম হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। কারণ, আবার বলছি, আমার বিচারবুদ্ধিতে ১৯৪৩-এর ঘটনায় যে-সমস্যা চিত্রিত হয়েছে, যে-যন্ত্রণার কথা বলা হয়েছে তা পৃথিবীর কোথাও অজানা নয়, কোনও জাতিই এই অভিজ্ঞতা এড়িয়ে চলতে পারেনি। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ তো নয়ই।

আগে যে কথা বলেছিলাম: ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে প্রতিক্রিয়ায় যে ফারাক দেখা যায় তা প্রায় সবটাই ব্যক্তির রুচি, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করি। এ- দেশে ও-দেশের মধ্যে এ-ক্ষেত্রে কোনও তফাত আছে বলে আমি মনে করি না। জন কোলম্যান যখন 'কলকাতা ৭১'-কে বাতিল করে দেন এবং বেসিল রাইট যখন সেই ছবি নিয়েই মুখর হয়ে ওঠেন তখন এ-কথা একরকম হলফ করেই বলা সম্ভব যে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠিতে এই তফাত-এর হদিশ পাওয়া যায় না, এর হিসেব মিলবে একমাত্র ব্যক্তির রুচি-শিক্ষা-অভিজ্ঞতায়, মিলবে ব্যক্তির নিজস্ব দর্শনে। এই দর্শনের অমিল কলকাতার দর্শকদের মধ্যে যেমন স্পষ্ট, বিদেশের দর্শকদের মধ্যেও তা উপস্থিত।

প্রশ্ন: বিদেশে যখন আপনার শিল্প-সাধনা স্বীকৃতি পেল, তখন স্বদেশের পটভূমি মনে পড়া স্বাভাবিক। তাই জিজ্ঞেস করছি, সিনেমার ভাষা আন্তর্জাতিক ঠিকই; কিন্তু

তা কি গণিতের ভাষার সমান আন্তর্জাতিক, না কবিতার ভাষার অনুরূপ? কবিতার শব্দে, শব্দ-বন্ধে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে একটি সমগ্র জাতির স্মৃতি, ইতিহাস, ভাব-ভাবনার অনুষঙ্গ—সমস্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ফিল্‌মের ভাষাতেও কি এ-সব গেঁথে গেঁথে যায়?

উত্তর: যদি আপনার প্রশ্ন ঠিক বুঝে থাকি: আগের প্রশ্নে আপনার জিজ্ঞাস্য ছিল জাতি বা দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দর্শকের মানসিকতাকে প্রভাবিত করে কি না, এবং করলে কতখানি। বর্তমান প্রশ্নে আপনার জিজ্ঞাস্য, চিত্রনির্মাতার ওপর উপরোক্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কতখানি কার্যকর এবং চিত্রনির্মাতা এই ঐতিহ্যকে আদৌ এড়িয়ে চলতে পারেন কি না। এই তো?

আগের প্রশ্নের জবাবে আমি বলতে চেষ্টা করেছি যে একই দেশের মানুষ একই সাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েও একই ঘটনায় বিভিন্নভাবে react করে থাকেন। অন্তত আমার ছবির ক্ষেত্রে আমি তাই দেখেছি। এবং সেই কথাই আমি বলেছি। এ-দেশের মানুষ হিসেবে আপনিও নিশ্চয়ই তা লক্ষ করেছেন। এবং করে চলেছেন প্রতিমুহূর্তে। অতীতে, অনেক আগে, একই দেশের মানুষের মধ্যে এতখানি মতপার্থক্য তেমন করে স্পষ্ট হয়ে উঠত কি না আমার জানা নেই। হয়তো নয়। হয়তো পার্থক্য তখন প্রকট হয়ে উঠত দেশ থেকে দেশে, গোষ্ঠী থেকে গোষ্ঠীতে, শ্রেণি থেকে শ্রেণিতে। হয়তো মত তখন গড়ে উঠত, আপনারই ভাষায়, দেশের বা জাতির স্মৃতি, ইতিহাস, ভাব-ভাবনার 'বিশুদ্ধ' পথ বেয়ে। 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' মারফত যা তখন পাওয়া যেত অথবা প্রতিফলিত হত সেকালের দর্শনে, হয়তো সেগুলোর একটা 'দেশজ' চেহারা ছিল। কিন্তু আজ, এই বিজ্ঞানের যুগে, যখন সময় ও ভৌগোলিক দূরত্বের ফারাক অস্বাভাবিক গতিতে ছোটো হয়ে আসছে, যখন সভ্যজগতের কোথাও সাংস্কৃতিক জীবন social anthropologist-এর ভাষায় আর virgin থাকতে পারছে না, অর্থাৎ যখন আমরা, পৃথিবীর সবাই, মোটামুটি কমবেশি মিশ্র-সংস্কৃতির আওতায় এসে পড়েছি তখন আমাদের, আধুনিক মানুষের, চিন্তার ভাবনায় দর্শনে আমরা এই মুহূর্তে কতখানি 'বিশুদ্ধ' থাকতে পারছি তা অবশ্যই ভেবে দেখা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে আরও বলব: এই মুহূর্তে, বর্তমান জগতে technology-র এই অগ্রগতির মুখে, 'বিশুদ্ধ' থাকার জন্য লড়াই করবার আর প্রয়োজন আছে কি? যা হোক, আপনার বর্তমান প্রশ্নে আসা যাক।

নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে, গত শতাব্দীতে একসময়ে ছবি-আঁকিয়েরা ফোটোগ্রাফিকে বড়োই ছোটো নজরে দেখতেন, ভাবতেন ব্যাপারটা একেবারেই যন্ত্রসর্বস্ব এবং সে-কারণে শিল্পরস সঞ্চারে অপারগ। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, ফোটোগ্রাফি নামক বস্তুটি যন্ত্র ও রসায়নশাস্ত্র দ্বারা চালিত হয়েও রীতিমতো

প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। দেখা গেল, ফোটোগ্রাফার তাঁর বিচারবুদ্ধি ও কলাকৌশল প্রয়োগ করলেন তাঁর কাজে, যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করলেন তাঁর রুচি ও বোধ অনুযায়ী, line এবং tone-এর বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে শিল্পসমৃদ্ধ করে তুললেন ফোটোগ্রাফিকে। এখন প্রশ্ন করব: ফোটোগ্রাফির মধ্যে কি কেউ কখনও জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ছোঁয়াচ পাবেন? যদি কেউ মনে করেন পাবেন তা হলে জিজ্ঞেস করব, ফোটোগ্রাফির linear এবং tonal composition-এ কেউ কি কখনও দেশজ গন্ধ আবিষ্কার করতে পেরেছেন?

বিজ্ঞানের এই শাখারই পরবর্তী ধাপ হল moving pictures অর্থাৎ চলচ্চিত্র। তার বেশ কিছুদিন পরে এই চলমান চিত্রে সংযোজিত হল শব্দ। এবং দুইয়ের সংমিশ্রণই যা দাঁড়াল তাকেই আজ বলে থাকি ফিল্‌ম। অর্থাৎ আজ ফিল্‌ম বলে যে-বস্তুটিকে আমরা বুঝি সেই বস্তুটি অনেকাংশেই একটি technological performance—যার গঠন-পদ্ধতি ফোটোগ্রাফি ইত্যাদির চেয়ে ঢের বেশি জটিল এবং শিল্পমাধ্যম হিসেবে যার সম্ভাবনা প্রচণ্ড।

ফোটোগ্রাফি সম্পর্কে আমার যা বক্তব্য, অবশ্যই বুঝতে পারছেন, ফিল্‌মের গঠন-পদ্ধতি সম্পর্কেও আমি প্রায় সেই কথাই বলব। এবং প্রশ্ন করব: ফিল্‌ম বলতে যতটুকু technological performance বুঝি, তার মধ্যে কেউ কি বিশেষ কোনও জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ছোঁয়াচ পাবেন? কোনও 'দেশজ' গন্ধ? আঞ্চলিক আমেজ?

অবশ্যই, atomic reactor যে-অর্থে technological performance, সেই অর্থে ফিল্‌ম তা নয়। এখানে technology-র ওপর প্রতিমুহূর্তে যার খবরদারি চলে তার নাম মন। মনের রকমফের আছে, অতএব technology'-র ব্যাবহারেও। যদি বলেন, এই ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই জাতীয় চরিত্রের আন্দাজ পাওয়া যায়, আমি তা মানতে নারাজ। ভারতীয় ফিল্‌মের গতি, প্রায়ই দেখতে পাই, অতিমাত্রায় মন্থর। কেন? অনেকের মতে, ওটাই নাকি ভারতীয় ট্র্যাডিশনের একটি বিশিষ্ট দিক। তাই যদি হয়, ব্রেসঁ-র ফিল্‌ম দেখে কী বলব? আমরা জানি, জাপানিদের বসবার একটা প্রাচীন রীতি আছে—হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসা। ওজুকেও দেখেছি মাটিতে ক্যামেরা বসিয়ে ছবি তুলেছেন। অনেকে বলে থাকেন ওইভাবেই নাকি ওজু তাঁর ছবিতে জাপানি গন্ধ ছড়াতে পেরেছেন। কিন্তু জাপানি পোশাকে সাজিয়ে কোনও জাপানি মেয়েকে যদি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ক্যামেরায় ধরা যায়? অথবা মাটিতে ক্যামেরা বসিয়ে যদি সাঁচির ফটকের ছবি তোলা হয়? অথবা এথেন্সের কোনও প্রাচীন মহিমার? কিংবা কার্থিজেব কোনও ভগ্নস্তূপের? এ-সবের কোনও কিছুতেই কি কোনও বাড়তি অর্থ আরোপিত হয়? কোনও দেশ বা জাতির সত্তারূপের সন্ধান পাওয়া যায় কি এ-সবের মধ্য দিয়ে?

এ-কথা সত্যি যে ইন্দির ঠাকরুনের মুখের গঠনে, বচনে, বসনে, তার গ্রামীণ পথ পরিক্রমায় এবং তার গল্প বলার ঢঙে গ্রামবাংলার এক নিখুঁত শারীরিক অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এবং এও সত্যি যে সত্যজিৎ রায়ের মতো তাঁকে অনেক আগে ডনস্কয়ও আমাদের সামনে হাজির করেছেন ম্যাক্সিমোভিচের দিদিমাকে—যার গঠন, বচন, বসন, পথপরিক্রমা ও গল্প বলার ঢঙের মধ্য দিয়ে, আমরা পরিষ্কার দেখেছি, সেকেলে রুশ সমাজের একটি শারীরিক চেহারা। কিন্তু শারীরিকতার এই যে ফারাক, তা কি ফিল্‌মি ভাষার প্রসাদগুণে? আমি বলব, ভাষায় নয়, এই ফারাক আমরা দেখতে পাব পারিপার্শ্বিকের শরীরে, দৃশ্যবস্তুতে ও শব্দে, ইন্দির ঠাকরুন ও ম্যাক্সিমোভিচের দিদিমার মুখের গঠনে, বচনে, বসনে, তাদের environmental reality-তে! বাকি যে তফাতটুকু আমাদের নজরে পড়ে তা সত্যজিৎ রায় ও ডনস্কয়ের ব্যক্তিমানসে ও তাঁদের নিজস্ব স্টাইলে।

আরও বলি। আমার এক কবি বন্ধু আমাকে বলেছিলেন, ছেলেবেলার অপুর মানসিক জগৎ একান্তভাবেই ভারতীয়। কূট তর্ক তুলব না, কিন্তু মনে পড়ে অপুর বয়সি আর একটি ছেলেকে আমরা দেখেছি ফ্লাহার্টির 'লুসিয়ানা স্টোরি'-তে। জিজ্ঞাসা করব: এই দু'টি ছবিতে ফিল্‌মি ভাষার তফাত কি খুব একটা দেখতে পেয়েছেন? এবং ঐতিহ্যের শাসন?

'সুবর্ণরেখা'-র কথা ভাবুন। সেই মেয়েটি, সীতা যার নাম। শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশে গল্প শুনতে শুনতে এগিয়ে চলেছে, রামায়ণের গল্প সম্ভবত। বোমার মতো ফেটে হঠাৎ আবির্ভাব বিকট-দর্শন কালীমূর্তির, সমস্ত পর্দা জুড়ে। মেয়েটির ভয়ার্ত মুখ। ছবি সমস্ত মিলিয়ে মুহূর্তের জন্য দর্শকেরও বুকের ধুকধুকি স্তব্ধ হয়ে যায়। মুখোশের আড়াল থেকে বহুরূপীর মুখ বেরিয়ে আসে, হাসছে বহুরূপী। আবার সব ঠিক, যেমন ছিল। একটি অসাধারণ মুহূর্ত, অর্থবহ, তাৎপর্যে ঠাসা এক প্রতীকী ব্যঞ্জনা, একান্তভাবেই ফিল্মের ভাষায় বিধৃত। কিন্তু এই নিয়ে যদি কোনও শিল্পরসিক ভারতীয় সত্তারূপের উৎস সন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং তাই করতে গিয়ে উৎকট রকমের বাড়াবাড়ি করেন (আদ্যাশক্তি, আর্কিটাইপ, Confrontation ইত্যাদি) তা হলে অবশ্যই তাঁকে আমি Hindu chauvinism-এর দায়ে অভিযুক্ত করতে রাজি আছি।

তাই বলি, যখন দেখেছি পৃথিবী এগিয়ে চলেছে দুর্বার বেগে, দেওয়ালের পর দেওয়াল যখন ভেঙে চলেছে আধুনিক বিজ্ঞান, চাঁদের চরকা-কাটা বুড়ি যখন চাঁদের দেশ থেকে বিতাড়িত, মিথ যখন ভাঙছে অথবা সার্বিক হয়ে উঠছে, যখন দেখি সাহারা বা সাইবেরিয়ার মাটিতে চুটিয়ে ফসল ফলানো হচ্ছে, যখন সময় ও দূরত্বকে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে এসেছে আজকের মানুষ, যখন সারা পৃথিবী জুড়ে সংস্কৃতির আসরে cross-fertilization-এর চাষ হচ্ছে অপ্রতিহত গতিতে, সেখানে

স্বতন্ত্রীকরণের প্রাণান্তকর এই চেষ্টা কেন? এই চেষ্টা কি কষ্টকল্পিত নয়? আজকের এই বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ায়?

ভাষার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সেই মন্তব্যটি মনে পড়ছে : "স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়াই রক্ষা।" স্বাতন্ত্র্য আছে জানি, অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তা আছে বলে রক্ষা কেন? স্বাভাবিক কারণেই আজ কি সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি না যে পরস্পরের মধ্যে বোঝাবুঝির আগ্রহ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে? এবং ফলে স্বাতন্ত্র্যের বেড়া কি ভেঙে পড়ছে না? এবং তা কি আমার আপনার সকলেরই অভিপ্রেত নয়? রবীন্দ্রনাথের কথাটা আজ যেন কেমন সেকেলে বলে মনে হয়।

জানি না আপনাকে চটিয়ে দিলাম কি না। কে জানে, হয়তো আমাকে cosmopolitanism-এর দায়ে অভিযুক্ত করবেন।

প্রশ্নোত্তর : ৩

প্রশ্ন: 'পদাতিক' সম্পর্কে যা শুনেছি তা শুনে মনে হয়েছে 'ইন্টারভিউ', 'কলকাতা-৭১' এবং 'পদাতিক' মিলিয়ে একটা trilogy হয়ে উঠেছে। 'ইন্টারভিউ' যখন করেছিলেন তখন এ জাতীয় trilogy করার সচেতন কোনও পরিকল্পনা আপনার ছিল কি?

উত্তর: 'ইন্টারভিউ' গল্পটা আমি পাই বহু আগে। সেই ১৯৫৫ সালে গল্পটা প্রথম আমার হাতে আসে। তখন অবশ্য গল্পটা এরকম ছিল না যেরকম ছবিতে আছে। অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। তখনই গল্পটা হাতে পেয়ে মোদ্দা কাঠামোটা আমার মনে লেগেছিল এবং তখন থেকেই ভেবেছি কীভাবে ছবি করা যায়, কী করা যায়। এখন মনে হয় তখন যে করিনি সেটা খুব ভালো হয়েছে। আজকে "বুদ্ধি" বেড়েছে, সময় অনেক জটিল হয়েছে এবং 'ইন্টারভিউ'-এ যে প্রশ্নগুলো এসেছে, সেগুলি জরুরি হয়ে উঠেছে সময়ের ধাক্কায়। এবং সে-কারণেই মনে হয় 'ইন্টারভিউ' ছবিটি যে সময়ে করা উচিত ছিল, সেই সময়টাতেই আমি 'ইন্টারভিউ' করেছি। ১৯৭০ সালে আমি 'ইন্টারভিউ' করেছি, ১৯৫৫ সালে যে গল্পটা আমি পেয়েছিলাম, তার থেকে অনেক পরিবর্তন করেছি দু'জনে মিলে এবং সময়টাকে ধরার চেষ্টা করেছি।

যখন ছবিটা তৈরি করেছি তখন শুধু 'ইন্টারভিউ'ই করব ভেবেছিলাম। কিন্তু করবার পরে নানারকম প্রশ্ন আসে, দর্শকদের তরফ থেকে, সমালোচকদের তরফ থেকেও, প্রশ্ন আসে আমার নিজের মনেও। সেই সময় কলকাতার চেহারা আরও জটিল হয়ে উঠেছে, আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, আমার কাছে অনেকখানি তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। সে সময়ে আমার মনে হয়েছে 'ইন্টারভিউ'টাকে তো আমি আরও টানতে পারি এবং 'ইন্টারভিউ'-এরই একটা sequel হিসাবে এর পরবর্তী অধ্যায়টা আমি দেখাতে পারি।

তখনও কিন্তু আমি তৃতীয় পর্ব তৈরি করার জন্য তৈরি ছিলাম না। এবং সেই সময় হঠাৎ আমি বেশ খানিকটা marketable হয়ে গেলাম। ঘটনাটা আমাদের কাছে খুব অবাক লাগে। কিছু কিছু প্রোডিউসার আমাকে দিয়ে ছবি করাতে চাইলেন। সবাই

তখন বলছেন: ওই 'ভুবন সোম'-এর মতো একটা কিছু করুন। 'ভুবন সোম' আমি করেছিলাম ১৯৬৯ সালে। তখন আমার অবস্থাটা এইরকম যে কলকাতার বাইরে গিয়ে ছবি করার অসুবিধা আমার হত না, কেননা অনেক টাকাপয়সা পেতাম, পয়সাওয়ালা লোকজনদের সাহায্য সমর্থন সমস্ত কিছু পেতাম, যা খুশি তাই করতে পারতাম। কিন্তু সত্যি বলতে কী, কলকাতা তখন আমাকে জমিয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ 'ইন্টারভিউ' করার পরে, কলকাতা আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিল। তখন আমি ভেবেছি 'ইন্টারভিউ' ছবির পরবর্তী একটা অধ্যায় করা দরকার। তখন আমি 'কলকাতা ৭১' তৈরি করি এবং 'কলকাতা ৭১' করতে করতে আমার মনে হয়েছে এটাই তো শেষ নয়, এরপরে আর একটা করা যেতে পারে। এইভাবে ক্রমশ একটা ছবি যখন করেছি তখন আর একটা করার কথা মনে হয়েছে। আবার সেইটা করতে গিয়ে আরও একটা করার কথা মনে এসেছে। এইভাবে আমি এখন 'পদাতিক'-এ এসে পড়েছি এবং সেটা হচ্ছে 'কলকাতা ৭১'-এর পরবর্তী অধ্যায়।

প্রতিমুহূর্তেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠেছে, আরও complex হয়ে উঠছে, আরও significant হয়ে উঠছে। এবং এই সমস্ত ব্যাপার Afro-Asian reality-র সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে প্রতিমুহূর্তেই ভেবেছি কীভাবে এই গোটা ব্যাপারটাকে বৃহত্তর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়। 'ইন্টারভিউ' কলকাতার ওপর, 'কলকাতা ৭১' কলকাতা নিয়ে, 'পদাতিক'ও কলকাতার ওপর। কিন্তু এটা শুধু কলকাতা নয়, এটা সারা ভারতবর্ষ এবং আরও broader scale-এ এর মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে সমগ্র আফ্রো-এশীয় বাস্তবতা। এই ব্যাপারটাই আমরা ধরবার চেষ্টা করেছি।

দু'মাস আগে আমি বার্লিনে যাই, International forum-এ। সেখানে রাজনৈতিক ছবিই দেখানো হয় মোটামুটি এবং সমস্ত ব্যাপারটা অর্থাৎ সমস্ত উৎসবটাই রাজনৈতিক সুরে বাঁধা। সেখানে কিছু লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্র পরিচালক ছিলেন, গ্রিসের একজন খুব বিখ্যাত পরিচালক ছিলেন, এবং তাঁরা সকলেই মনে-প্রাণে, চিন্তায়-ভাবনায় বামপন্থী। তাঁদের সঙ্গে একদিন আমি কথাবার্তা বলছিলাম এবং কথায় কথায় আমি তাঁদের বললাম, আমি একটা ছবির শুটিং শেষ করেই আসছি। 'পদাতিক'-এর গল্পটা আমি তাঁদের বললাম: ছবির thesis, ছবির বক্তব্য, ছবির পেছনকার ইতিহাস, কলকাতার অবস্থা। এ-সব শুনে লাতিন আমেরিকার দু-তিনজন পরিচালক সমস্বরে বলে উঠলেন: এ তো আমাদের কথা। এবং আর্জেন্টিনার একজন পরিচালক বলে উঠলেন: আমি ঠিক এই বিষয় নিয়েই ছবি করছি।

এ-ছবি যখন আমরা করি তখন সবসময়ই কলকাতার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থাকে কেন্দ্র করেই ভেবেছি। কলকাতা থেকে একেবারেই বাইরে যাইনি। এবং

সবসময়েই এই আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতের কথাটা আমাদের মাথায় ছিল। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা কথা বলা হয়েছিল যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়াজোড়া গণতান্ত্রিক শক্তির সংগ্রামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। এখানেও আমাদের মনে হয়েছে যে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের বর্তমান যে সংগ্রাম, যে লড়াই, তার সঙ্গে সারা পৃথিবীর বামপন্থী আন্দোলনের সম্পর্ক রয়ে গেছে। এ-ছবিতে আমাদের focus বিন্দুমাত্র না হারিয়ে আমরা বলতে চেয়েছি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা এবং এ-কথা বলতে গিয়ে আরও বলতে চেয়েছি যে এই লড়াই করতে গিয়ে আমরা যেন left establishment-এর শিকার না হয়ে পড়ি। Left establishment কথাটা আমি খুব জোর দিয়েই বলছি। সমস্তরকম সংকীর্ণতা, সমস্তরকম sectarianism-এর বিরুদ্ধে এই ছবি, বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমস্ত রকম সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে এই ছবি। আমরা এ-ছবিতে এ-কথা বলার চেষ্টা করেছি যে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে আমাদের চেষ্টা করতে হবে, দেখতে হবে, বৃহত্তম জমায়েত, largest mobilisation কীভাবে সম্ভব। 'ইন্টারভিউ' ছবি করার সময় আমরা ওভাবে ভাবিনি। একটা একটা করে ছবি করেছি আর আমাদের চেতনা একটা নতুন স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে। এমনি করে আমরা এখানে পৌঁছেছি।

প্রশ্ন: আপনার 'কলকাতা ৭১' নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, বহু প্রশ্ন এসেছে, যেমন 'কলকাতা ৭১'-এর ছেলেটি কে? আপনি দেখিয়েছেন 'ইন্টারভিউ' ছবি থেকে ক্রোধের বিবর্তন, 'কলকাতা ৭১'-এ যা একটা সামাজিক ঐতিহাসিক চেহারা নিয়েছে। কিন্তু অসহনীয় দারিদ্র্য এবং শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐতিহাসিক চেহারা ওই ছেলেটির মধ্যে প্রতিফলিত নয় বলে অনেকেই বলেছেন। কাজেই ওই ছেলেটি কে? ওই ছেলেটি কার বিরুদ্ধে লড়ছে? আমাদের এখানে ছবি করার ক্ষেত্রে অসুবিধার কথা মনে রেখেও প্রশ্ন এসেছে শত্রুকে সরাসরি চিহ্নিত করায় আপনার দ্বিধা এবং ইতস্তত মনোভাব সম্পর্কে।

উত্তর: আমি তাহলে একটু আগে থেকেই শুরু করি। 'ইন্টারভিউ'তে রঞ্জিত মল্লিক নামক ছেলেটি যে চাকরির জন্য ঘুরছিল, ছবির শেষে সে যখন চাকরি পেল না তখন আমরা half real, half fantasy-র মতো একটা পরিবেশের ভেতর চলে গেছি। আমি বলব, আমরা তখন চলে গেছি একটা আধা abstract sequence-এ, এক আধা-বিমূর্ত অবস্থায়। সেই অধ্যায়টির মতো কোনও কিছু আমি অথবা আপনি ব্যাবহারিক জীবনে বা ব্যাবহারিক পৃথিবীতে দেখিনি। সেখানে অন্ধকারে একজন বসে আছে, তার মুখটা শুধু দেখা যাচ্ছে, সিগারেটের প্যাকেট সে ফেলে দিল, আওয়াজ হল না কিছুই। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা abstraction, একটা আধা-বিমূর্ত

অবস্থা। ছবির গল্প বলা তখন শেষ হয়ে গেছে। নায়ককে তখন আমরা নিয়ে আসি অন্ধকারের সামনে, প্রশ্ন করি, একের পর এক প্রশ্নে নায়ককে ভয়ংকরভাবে উত্তেজিত করে তুলি। তারপর সে হঠাৎ একটি মূর্তির সামনে এসে দাঁড়ায় এবং মূর্তিটাকে ভাঙতে আরম্ভ করে সে। ছেলেটি তখন ভবানীপুর নিবাসী, একটি প্রেসে চাকুরি করা এবং একটি ইন্দো-ব্রিটিশ ফার্মের চাকুরিপ্রার্থী রঞ্জিত মল্লিক নয়। সে তখন সেই মুহূর্তে একটি idea, একটা concept। সে যখন সমস্ত কিছু ভাঙতে আরম্ভ করে তখন একটা concept-এর স্তরে তার উত্তরণ ঘটেছে, মানুষের চেহারা নিয়ে একটা idea-তে এসে দাঁড়িয়েছে। সে যখন ভাঙতে আরম্ভ করে তখন সমস্ত ব্যাপারটা একটা symbol-এর পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়।

তারপর আমরা 'কলকাতা ৭১'-এ আসি। ছেলেটি যখন বলে: "হাজার বছর ধরে আমি হেঁটে চলেছি", সেখানে সে কিন্তু দু'হাত, দু'পা দু'চোখ বিশিষ্ট একটি যুবক নয়। এখানেও ছেলেটি একটা concept, যার বয়স কুড়ি বছর। এবং সুকান্তর সেই কবিতার কথা মনে পড়ে যায়: "বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন"।

এখানে, 'কলকাতা ৭১'-এ, শুরুতেই একটা concept, ভীষণ youthful concept। ছেলেটির বয়স আমি কুড়ি বছর রেখেছি এ-কারণে যে কুড়ি বছর মানেই হচ্ছে ভীষণ youthful। যে youthful, যে সংগ্রামী, যে militant, যে কোনও কিছুকে পরোয়া করে না, যে sensitive এবং যে পবিত্র: এইরকম একটা concept-এর কথাই আমি ভেবেছি। সে হাজার বছর ধরে নানা যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এসেছে এবং এই সিদ্ধান্তে এসে দাঁড়িয়েছে যে আমাদের ইতিহাস হাজার বছর বা আরও বেশি সময় ধরে দারিদ্র্যের ইতিহাস, বঞ্চনার ইতিহাস, শোষণের ইতিহাস। রেডিয়োতে যখন জানানো হয় তখন একটা ছেলেই মারা গেছে, কিন্তু সে যখন ছবির শেষে আবার এসে দাঁড়ায়, সকালে খুন হয়ে যাওয়া একটি বিশ বছরের ছেলে, তখন concept হিসাবেই দাঁড়ায়। সে বলছে: আজ সকালে আমাকে মেরে ফেলা হয়েছে। যে ঘটনাগুলি ও বলে, ওখানে reality এবং fantasy-র একটা মিশ্রণ ঘটেছে। সে বলে: আমি হাজার বছর ধরে হেঁটে চলেছি, হাজার বছর ধরে আমি দেখেছি দারিদ্র্য, মালিন্য, বঞ্চনা। আমি মরেছি কেননা আমার অপরাধ আমি react করেছি, কেননা আমাদের সমাজে, এই শোষণভিত্তিক সমাজে, react করাটা পাপ। প্রতিক্রিয়ার শক্তি তাকে খতম করেছে। সেখানে সে যেহেতু দাঁড়িয়েছে রক্তমাংসের মানুষের চেহারা নিয়ে, তার কপাল থেকে রক্ত পড়ছে, অনেকে অনেক কিছু ভেবেছেন। অনেকে মনে করেছেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন: ছেলেটি কি C.P.I (M.L)-এর? প্রশ্ন করা হয়েছে সে কি C.P.I (M) না C.P.I না অন্য কোনও দলের সভ্য।

অনেকে আবার তাকে পার্ক স্ট্রিটের শুরু পাঞ্জাবি পরা যুবক হিসাবে চিহ্নিত

করেছেন। পুডোভকিনের 'Storm over Asia' ছবি থেকে এখানে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সেখানে একটি ছেলে, যে ছেলেটি কিন্তু আগাগোড়া রক্তমাংসে গড়া একটি চরিত্র, হঠাৎ ওপরের জানালা থেকে লাফিয়ে পড়ে। লাফিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত সে কিন্তু physical reality-রই একটা অঙ্গ এবং সমস্ত শারীরিকতা নিয়েই সে লাফিয়ে পড়ে। সে লাফিয়ে পড়ে কিন্তু তার হাত-পা ভাঙে না। [illegible] এ-কারণেই যে লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে একটা concept-এর রূপান্তরিত। তাকে দেখা যায় ঘোড়ার পিঠে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে সে নেতৃত্ব দিচ্ছে বিরাট জনতাকে, যে জনতা সংগ্রাম করছে সমস্তরকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। এ-ব্যাপারটা সেই বিশেষ যুগের বাস্তবতা নয়, কিন্তু সেটা তখন concept-এর রাজ্যে গিয়ে পৌঁছেছে। সেটা নিয়েও পুডোভকিনকে বহু প্রশ্ন শুনতে হয়েছিল। এখন সেখানে এই ব্যাপারটা যদি আমরা accept করে নিতে পারি তো আজ এটাকে accept করে নিতে অসুবিধে কী আছে আমি জানি না। কাজেই এ-ছেলেটিকে গুরু পাঞ্জাবি পরা পার্ক স্ট্রিটের ছেলে হিসেবে literally নেওয়াটা আশ্চর্য লাগে। শিল্প সমালোচনা করতে গিয়ে প্রতিমুহূর্তে মানুষ যখন literal হয়ে পড়েন, তখন তাঁর শিল্পবোধ সম্পর্কে আমার প্রশ্ন জাগে।

আমরা এখানে ছবি ও শব্দের মারফত একটা চরিত্রকে রক্তমাংস ছাড়িয়ে বিমূর্ত এক ভাবনায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছি। একটা মৃত লোক আবার দাঁড়ায় না, লোকজনের সঙ্গে কথা বলে না। এখানে একজন মারা গেছে, আবার কথা বলছে, প্রত্যেকটা গল্পের সামনে এসে গ্রিক কোরাসের মতো বলতে আরম্ভ করছে, বিশ্লেষণ করছে। এ তো বাস্তবে হয় না, কাজেই হঠাৎ ওই ধরনের ভাবার কী অর্থ হয় আমি জানি না। এটা বুঝতে তাঁদের অসুবিধা হয় কেন? এটা থেকেই বোঝা যায় যে শিল্পবোধ সম্পর্কে এইসব সমালোচক কত অজ্ঞ। আমি শিল্পের কোনও norms-এ বিশ্বাস করি না কেননা সমস্ত কিছুই প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে, সমস্ত কিছুই পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং মানসিক চেতনার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু শিল্পের যে কতকগুলো সামান্যতম basis আছে, কতকগুলো steps আছে, সেগুলি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা এতই অস্বচ্ছ যে তাঁরা এ জাতীয় কথা বলেন। একজন তো বললেন: এ তো নকশাল ছেলে। নকশাল কী করে বুঝলেন? না, ওই গুলি খেয়েছে। যেন সে সময় একমাত্র নকশালরাই গুলি খেয়েছে। এই সমস্ত ধারণা থেকেই ছবি সম্পর্কে এ জাতীয় বিশ্লেষণ বা বিচারবোধ আসে। আর এটা থেকে বোঝা যায় আমাদের দেশে বামপন্থী রাজনীতি অবস্থা কত গোলমেলে, নিজেদের মধ্যে কত অন্তর্দ্বন্দ্ব, ফলে কতখানি বোঝার অসুবিধা হচ্ছে এবং সমস্ত ব্যাপারটা কীভাবে purely personal equation-এ এসে দাঁড়াচ্ছে এবং সেটা কতখানি ভয়ঙ্কর, কতখানি সর্বনাশা হয়ে পড়ছে।

প্রশ্ন: শত্রুকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে?

উত্তর: ১৯৭১-এর ছবি যা মুক্তি পেল ১৯৭২-এ, ১৯৭২-এর মানুষ সে ছবি দেখেছেন। আমি আপনাদের একটা ঘটনার কথা বলছি। হল থেকে ছবি দেখে বেরিয়ে এক ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরলেন, আমি তাঁকে চিনি না। আমি দেখলাম তাঁর হাত কাঁপছে, ঘামছে। তিনি বললেন, আমার শরীরে এখনও একাত্তর সালের একখানা বুলেট রয়েছে, বার করা যায়নি। আমি জানি, আমি বুঝি, এ-ছবি আমি বুঝি, এ-ছবি আমি বুঝতে পারি। আমার কাছে এটা একটা মস্ত ব্যাপার, অনেক অনেক কিছু পাওয়া, এর চাইতে আমি আর কী চাইতে পারি! আমি জানি না ভদ্রলোক কী রাজনীতি করেন, কোনও দলে আছেন, তিনি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক কি না। আমি শুধু এটুকু জানি যে তিনি ছবি দেখে ছবিকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, মিলিয়ে নিতে পেরেছেন।

আর একটা ঘটনা বলি। এক ভদ্রলোক, পশ্চিমবঙ্গের লোক নন, মস্তবড়ো সরকারি অফিসার, policy-maker বলা চলে। আমার ছবি দেখে আমার এক বন্ধু বলেছেন, আমি আবার আমার জায়গায় ফিরে যাব, ফিরে গিয়ে আমার যা labour policy, আমি যেটা প্রয়োগ করি, করে থাকি, এবং করবার জন্য চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত, সেটা আমাকে করতে হবে। কিন্তু তিন দিন বোধহয় আমি খুব সুস্থ মনে এই কাজ করতে পারব না। আর এক ভদ্রলোককে আমি জানি; তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তিনিও বাঙালি নন। তিনি বললেন, আমি গাড়ি করে ছবি দেখতে গিয়েছিলাম, ছবি দেখেছি, দেখে গাড়ি করেই ফিরে এসেছি, কিন্তু you made me feel ashamed of myself. তিনি গোটা ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন, connect করতে পেরেছেন।

আসল শত্রুকে সরাসরি চিনিয়ে দেবার প্রয়োজন সবসময়েই আছে বলে আমি মনে করি না। যখন প্রয়োজন হবে তখন নিশ্চয়ই তা করা যাবে এবং সুবিধা-অসুবিধার যে প্রশ্নগুলো আপনি রেখেছেন, সেগুলো তো নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু শত্রুকে এ-কথা সবসময়েই যে খোলাখুলি বলতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা আছে বলে আমি মনে করি না। ওটা মানুষ নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে connect করে নিতে পারবে। এই connect করাটাই বড়ো কথা এবং শিল্পের দায়িত্ব। ফ্রস্টারও বলেছেন যে শিল্পের দায়িত্ব হচ্ছে to connect, এবং এই প্রক্রিয়াটিকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন চৈতন্য দিয়ে দেখা। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'জীবনস্মৃতি' তে আছে—সদর স্ট্রিটে সকালে বেরিয়ে রাস্তায়: এতদিন শুধু চোখের দেখাই দেখিয়া আসিয়াছি, আজ যেন চৈতন্য দিয়া দেখিলাম।

এই কথাটা আইজেনস্টাইনও বলেছিলেন। তিনি intellectual perception-এর কথা বলেছেন, বলেছেন দৃশ্যবস্তুকে intellectually দেখতে হবে এবং সেখানে এই connect করার প্রশ্নই এসে পড়ে। আপনি যখন একটা ঘড়ি দেখেন, এটাও

আইজেনস্টাইনের কথা, চারটে বেজে গেল, তখন আপনি দেখছেন দুটো কাঁটা একটা নির্দিষ্ট নব্বুই ডিগ্রি angle-এ দাঁড়িয়ে। যখন তিনটে বাজে তখন দেখলেন নব্বুই ডিগ্রি angle-এ দুটো কাঁটা দাঁড়িয়ে আছে, এটাই আপনি physically দেখলেন, অর্থাৎ আপনার চাক্ষুস দেখা, visual perception হচ্ছে তাই। কিন্তু intellectual দেখাটা কি হচ্ছে? আপনি ভাবছেন দু'ঘণ্টা পরে কী হবে, ট্রামে-বাসে জায়গা পাওয়া যাবে না, ভিড় ঠেলাঠেলি ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ চাক্ষুষ তিনটে বাজা দেখার অর্থটা পরিষ্কার ভাবনায় এসে দাঁড়াচ্ছে এবং অনেক ছবি আপনার মাথায় ভিড় করে এসেছে। অর্থাৎ চৈতন্য দিয়ে দেখা।

'কলকাতা ৭১' ছবিতে সেই ছেলেটা অর্থাৎ সেই concept-টা আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলছে: আমাকে কে গুলি করেছে আমি জানি কিন্তু বলব না; আপনারা suffer করুন যতদিন না আপনারা তাকে খুঁজে বার করতে পারেন। এখানে আপনার অর্থাৎ দর্শকের দায়িত্ব হচ্ছে intellectually দেখা, চৈতন্য দিয়ে দেখা এবং আপনি যদি connect করতে না পারেন তো তা হয় ছবি-করিয়ের ক্রটি, নয়তো সে দায়িত্ব আপনার ওপরই বর্তাচ্ছে; আপনি বুঝতে পারেননি।

প্রশ্ন: আপনার সাম্প্রতিক সমস্ত ছবিতে আপনি ফর্ম নিয়ে বহুবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন, ফলে আপনার ফর্ম এবং প্রকাশভঙ্গি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠছে। কাজেই আপনি যেটা বলতে চাইছেন দারিদ্র্য, শোষণ এবং প্রয়োজনীয় সংগ্রামের কথা, সেটা কীভাবে সবচেয়ে শোষিত সবচেয়ে দরিদ্র শ্রমিক-কৃষকের কাছে পৌঁছোবে? তারা কীভাবে গোটা ব্যাপারটা intellectually perceive করবে?

উত্তর: আমি একজন মস্ত মানুষের কথা বলছি। রবীন্দ্রনাথ ভূমিহীন কৃষকের কাছে কতখানি জায়গা পাবেন, সে নিয়ে নিশ্চয় আপনার আমার মনে কোনও প্রশ্ন নেই। তাই বলে রবীন্দ্রনাথকে তো আর বাতিল করে দেয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের পরে আর একজন রবীন্দ্রনাথ যে হবেন না এমন তো কোনও কথা নেই। রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ শিল্পী বা তাঁর চাইতেও বড়ো কেউ ভারতবর্ষে জন্মাতে পারেন, তিনি কিন্তু নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের ঢঙে লিখবেন না। তিনি অন্যভাবে লিখবেন, এবং অবশ্যই তাঁর লেখা আরও complex হবে, আরও জটিল হবে, হয়তো তা হবে না। যেমন আজ ডিকেন্স আর জেমস জয়েস এক কথা। ডিকেন্স পড়াটা যত সহজ, জেমস জয়েস পড়াটা তত সহজ নয়, ফয়েস্টহ্বাগনার পড়াটা যত সহজ, টমাস মান পড়াটা তত সহজ নয়, জেমস জয়েসের চাইতে ডারেল আরও দুর্বোধ্য, আরও জটিল। এখন, দোষটা তো তাঁদের নয়।

আবার দেখুন 'কলকাতা ৭১' ছবির শেষ সিকোয়েন্সটি। একটা হোটেল থেকে আরম্ভ করে যেখানে কোলাজের মতো করা হয়েছে, কোনও গল্প বলা নেই যে

জায়গায়, সেই সিকোয়েন্সটি শহরের বুদ্ধিমানেরা বেশির ভাগই বাতিল করে দিয়েছেন। বলেছেন ওটা বাজে, একেবারে crude, বড্ড গোলমেলে ইত্যাদি ইত্যাদি। গ্রামের খবর আমি জানি না, তবে দেখেছি যখন আমরা ছবিটা করেছি, re-recording-এর কাজ করছি, দোকানের ছেলেরা চা দিতে এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে, তারা দেখছে। তাদের লেখাপড়া, তাদের intellectual বোধ আমার আপনার চাইতে নিশ্চয়ই অনেকখানি কম, তবু এ জায়গাটা দেখে তারা অত্যন্ত খুশি। ওরা বলেছে: দারুণ করেছেন মৃণালদা, আমাদের কথা বলেছেন। ওদের যেটা ভালো লেগেছে, বুদ্ধিমানদের সেটা ভালো লাগেনি, বুদ্ধিমানেরা এই অংশটিকে সম্পূর্ণ বাতিল করেছেন। শুনেছি, আসানসোল অঞ্চলের কয়লাখনির শ্রমিকদেরও ওই অংশ ভালো লেগেছে।

কাজেই কোথায় দাঁড়াব আমরা? আমার চেয়ে কেউ বেশি খুশি হবে না যদি দেখি আমার ছবি সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে, যদি আমার বক্তব্য সকলে বুঝতে পারেন। ছবি জনপ্রিয় হবার অর্থই হচ্ছে সাধারণ মানুষ বেশি দেখেছেন, কেননা সাধারণ মানুষের সংখ্যাই তো বেশি। যদি তা না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে হয় আমি বোঝাতে পারিনি, নয় তাঁরা বুঝতে পারেননি।

এর কোনও সহজ সমাধান নেই, কোনও সহজ বিধান আমার জানা নেই। একমাত্র পথ হচ্ছে: আমি যেমন চেষ্টা করব সাধারণ মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য হওয়ায়, তেমনি সাধারণ মানুষের একটা প্রচণ্ড দায়িত্ব আছে আমাকে বোঝার। দায়িত্ব শুধু যিনি ছবি করেন সেই শিল্পকর্মীরই নয়, দায়িত্ব দর্শকদেরও যাঁদের জন্য ছবি করা। সুতরাং দু'দিক থেকেই আমাদের এগোতে হবে, অনেকটা two-way traffic-এর মতো। এবং এটা সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এখানে কোনওরকম সরলীকরণ করতে যাওয়াটা মারাত্মক হবে, ভুল হবে, প্রচণ্ড অপরাধ হবে। এই সরলীকরণ করার একটা প্রবণতা, একটা প্রচণ্ড চেষ্টা, অপচেষ্টাই বলব, প্রতিটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। এই প্রবণতা শিল্পীর পক্ষে ভয়ংকর হবে, সেটা কোনও সময়েই উচিত হবে না। একদিক থেকে আমি যেমন popular হবার চেষ্টা করব, আর একদিক থেকে আমি আমার কাজটিকে refine করারও চেষ্টা করব। এবং চলচ্চিত্র যেহেতু বিশেষ করে অনেকাংশেই একটা technological performance, সেহেতু এখানে অনেক বেশি টেকনিকের প্রশ্ন আছেই। কাজেই গোটা ব্যাপারটা নিয়ে একটা অনুশীলনের প্রয়োজন, এ প্রয়োজন আরও বাড়বে, দিনের পর দিন বাড়বে।

দীনেন্দ্র রায় বা নীহার গুপ্ত লেখক হিসাবে ভীষণ জনপ্রিয়। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি ততখানি জনপ্রিয়? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বেশি জটিল, অনেক বেশি কঠিন এঁদের চাইতে। নীহার গুপ্ত-রা অত্যন্ত সরলীকরণ করেন, তাঁদের

চরিত্র এবং পটভূমি অনেক ক্ষেত্রেই অবাস্তব। মানিকবাবুর সাহিত্য বস্তুনিষ্ঠ, মানিকবাবু দ্রষ্টা, বাস্তবতাকে তাঁর মতো এত স্পষ্ট করে বাংলা সাহিত্যে কেউ বলতে পেরেছেন কি? কিন্তু তিনি কি ততখানি জনপ্রিয়? তিনি জনপ্রিয় নন। সেজন্য কি তাঁকে বাতিল করে দেব? অবশ্যই নয়। সেখানে জনসাধারণের দায়িত্ব তাঁকে বোঝা, রাজনৈতিক দলগুলোর cultural wing-এর দায়িত্ব জনগণকে সেভাবে তৈরি করা যাতে তাঁরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বুঝতে পারেন। সারা পৃথিবীতে এই একই প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। আমার ছবি যদি চাষি মজুরদের উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে তো সেটা মস্ত বড়ো কথা, এর চাইতে বড়ো কিছু নেই। কিন্তু উদ্‌বুদ্ধ করার দায়িত্বটা যেমন আমার, তেমনি উদ্‌বুদ্ধ হওয়ার দায়িত্ব তাঁদেরও আছে। বিশেষ করে সমাজসচেতন মানুষদের এই উদ্‌বুদ্ধ করার ব্যাপারে দায়িত্ব অনেক বেশি।

প্রশ্ন: এবার 'পদাতিক' সম্পর্কে বলি। 'পদাতিক' করার সময় কোন কোন প্রশ্ন আপনার কাছে জরুরি হয়ে উঠেছিল?

উত্তর: আমি আগেই বলেছি 'পদাতিক' ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে। 'পদাতিক' ছবির মূল বিষয়বস্তু ওই একই: সমাজটাকে কী করে বাসযোগ্য করা যায়। আমাদের সমাজ এখনও বাসযোগ্য নয়, যেমন আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার দেশগুলো এখনও বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। সমাজটাকে বাসযোগ্য করতে গেলে নানারকম অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, নানারকম শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সেই লড়াইয়ের কথা, সেই লড়াইয়ের প্রয়োজনের কথা 'পদাতিক'-এ আছে, কিন্তু সে প্রসঙ্গে পরিষ্কার কোনও বিধান ছবিতে আমরা কখনও দিতে চাইনি। এ-কথাই বলতে চেয়েছি, সত্যিকারের বামপন্থী সংগ্রামী আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। এবং এই বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে আমরা বারবার দেখেছি, যেমন দেখেছি অপরাপর দেশেও, যে আমরা সবসময় sectarianism-এর বলি হয়ে দাঁড়াই, সবসময়েই আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলি। এবং বিচ্ছিন্নতা মানেই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা ধসে পড়া এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আরও চাগাড় দিয়ে ওঠা, আরও জোরদার হওয়া।

ছবিতে তাই আমরা বলেছি: প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে গেলে, বামপন্থী সংগ্রামী আন্দোলনকে জোরদার করতে গেলে, আমাদের বন্ধুদের বুঝতে হবে, বন্ধুর সংখ্যা বাড়াতে হবে, এবং সমস্তরকম sectarianism-এর বিরুদ্ধে, সমস্তরকম সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে, সমস্তরকম বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এ-কথাটাই আমরা বলার চেষ্টা করেছি 'পদাতিক-এ' এবং এ-প্রশ্নগুলোই আমাদের কাছে জরুরি হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে ছবির একটি বিশেষ সিকোয়েন্স-এ আমরা মাও-সে-তুং-এর ১৯২৬ সালের একটি বিশিষ্ট বক্তব্যকে তুলে ধরি। চিনের গণ-আন্দোলনের বিশ্লেষণ

করতে গিয়ে তিনি কতকগুলো অত্যন্ত জরুরি কথা বলেছিলেন যে তাত্ত্বিক বক্তব্য আমাদের দেশের পক্ষেও প্রযোজ্য বলে মনে করি।

প্রশ্ন: বন্ধুদের জমায়েত করা, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, এখানে শত্রুকে কীভাবে চিহ্নিত করেছেন বা করতে চেয়েছেন?

উত্তর: দেশের অবস্থা সঠিকভাবে বোঝানো গেলেই শত্রুকে চেনা এবং চিহ্নিত করা সহজ। দেশের যে অবস্থা আমরা দেখেছি, আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক গোটা অবস্থা যেভাবে দেখেছি, সেগুলো অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ছবিতে রয়েছে। দেশের মানুষই এ-ছবি দেখছেন, যাঁরা দেখেছেন তাঁরা connect করতে পারছেন। (এখানেও সেই connection-এর প্রশ্ন)। ছবিতে সমস্ত ব্যাপার যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেখানে সেই সমাজের মানুষ সহজেই connect করতে পারবেন, শত্রুকে চিনে নিতে তখন তাঁদের অসুবিধা হবে না, বুঝে নিতে পারবেন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে বন্ধুদের জড়ো করা দরকার, তাদের জমায়েত বাড়ানো দরকার। তখন তিনি বুঝে নিতে পারবেন প্রতিক্রিয়ার শক্তি কোনটা এবং লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা কতখানি।

প্রশ্ন: ছবির কাহিনিগত কাঠামোটা একটু বলুন—

উত্তর: কাহিনিগত কাঠামো হচ্ছে একটি ছেলে, রাজনৈতিক দলেরই একটি ছেলে, পালিয়েছিল, গ্রেফতার হয়, পুলিশ ভ্যান থেকে সে আবার পালিয়ে আসে। ছেলেটি দলের একজন অতি প্রয়োজনীয় কর্মী। সে আশ্রয় পায় এমন এক জায়গায় যেটা friendly, যেটা নিরাপদ, যেটা comfortable; সেই ফ্ল্যাটটির মালিক একজন মহিলা।

এই মহিলা একাই থাকেন, এবং পুরুষ-শাসিত সমাজে থাকার যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা তিনি পাচ্ছেন। তিনি স্বামীর কাছ থেকে চলে এসেছেন নানা কারণে। স্বামীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে। চলে এসেছেন ছেলেকে নিয়ে, ছেলেটি বাইরে থাকে। মেয়েটি বাঙালি নন, মেয়েটি পাঞ্জাবি এবং বাংলাদেশেই মানুষ। বাবা কলকাতাতেই কাজ করতেন। মেয়েটির political involvement শুধু এটুকুই যে তার ছোটো ভাই যে সম্পূর্ণভাবে আলাদা ছিল, সে কলকাতার একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিল। জড়িত ছিল বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই। এবং বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ ছিল এবং শেষ পর্যন্ত সে এখান থেকে চলে যায় পঞ্জাবে। পঞ্জাবে তখন প্রচণ্ড গোলমাল চলছিল। সেখান থেকে তার একটা চিঠি আসে এবং এটাই তার শেষ চিঠি, ছবিতে যা বলা হয়।

পঞ্জাব বেছে নেওয়ার কারণ হল পঞ্জাবেও ওই সময় একই ধরনের গোলমাল, ওই একই রাজনৈতিক উত্তাপ যা কলকাতায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি প্রতিমুহূর্তে—

প্রশ্ন: এভাবে কি ছবিতে সর্বভারতীয় একটা পরিপ্রেক্ষিত আনার চেষ্টা করেছেন?

উত্তর: হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লেগেছে। আমরা যখন বাংলা ছবি করি তখন সমস্ত বাংলা চরিত্র, যখন হিন্দি করি তখন সমস্ত হিন্দি চরিত্র, মালয়ালম করলে সমস্ত মালয়ালম চরিত্র। অথচ কলকাতার মতো একটা metropolitan শহরে একজন বাঙালির সঙ্গে অবাঙালির পরিচয়, সম্পর্ক, আলাপ হওয়া, জানাশোনা, বিবাহ বা একজন বাঙালির সঙ্গে মরাঠির বা একজন মরাঠির সঙ্গে অমরাঠির সম্পর্ক খুব স্বাভাবিক, খুব চালু। অথচ ছবি করতে গিয়ে আমরা এ-ব্যাপারটা ভুলে যাই। ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ অথচ ছবি করতে গিয়ে আমরা অত্যন্ত regional হয়ে পড়ি, বড্ড বেশি আঞ্চলিক হয়ে পড়ি চিন্তায়-ভাবনায়, সমস্ত কিছুতে। আজ সমস্ত পৃথিবীটা কত ছোটো হয়ে আসছে, এতটুকু একটা সংসারের মতো হয়ে আসছে। সেখানে আমরা এত সংকীর্ণ হয়ে পড়ব কেন?

ছবিটার কাহিনিগত কাঠামোতে আবার ফিরে আসছি। এই নিরাপদ আশ্রয়ে আমাদের ছবির ছেলেটি ভাবতে থাকে, চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে তার মনে নানারকম প্রশ্ন এসে ভিড় করে, তার পুরোনো কার্যকলাপ নিয়ে নানান প্রশ্ন তার কাছে ঘুরেফিরে আসে, জরুরি হয়ে পড়ে, সে নিজেকে প্রশ্নগুলি করতে চায়, প্রশ্নগুলি তুলে ধরতে চায়। মূল ব্যাপারটা তখন তার কাছে ধরা পড়ে। সে ভাবে—আমরা যেভাবে এগোচ্ছিলাম, যেভাবে এগোচ্ছি সেটা বিচ্ছিন্নতার পথ, সে পথে আমরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, জনসাধারণের সমর্থন আমরা পাচ্ছি না, জনসাধারণের সাহায্য-সহযোগিতা-সহানুভূতি আমরা পাচ্ছি না, জনগণকে যথেষ্ট সচেতন করে তুলতে পারছি না, এ-পথ মারাত্মক হয়ে পড়ছে, ক্ষতিকারক হচ্ছে এবং এভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে, আরও জোরদার হয়ে উঠছে, এ পথে চললে আমরা শেষ হয়ে যাব। সুতরাং এটা এখনই মেরামত করা দরকার, এর বিরুদ্ধে, এই sectarianism-এর বিরুদ্ধে লড়াই চালানো দরকার। এই বিচ্ছিন্নতামুখী আন্দোলনের মোড় ঘোরাতে হবে, আমাদের আত্মসমালোচনা করতে হবে, আত্মানুসন্ধান করতে হবে এবং এভাবে নিজেদের সমস্ত ভুলত্রুটি মেরামত করে আবার ঠিক পথে এগোতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের গল্পের মূল কাঠামো এবং বক্তব্য।

প্রশ্ন: সে জায়গায় অর্থাৎ ছবির শেষে ছেলেটি নতুন উপলব্ধির স্তরে কীভাবে পৌঁছোচ্ছে? positive দিকটি কী?

উত্তর: positive দিক বলতে আপনি যদি বলেন আমি কোনও party line suggest করেছি কি না তা হলে বলি: না। সেটা আমার দায়িত্ব নয়। শিল্পকর্মীর দায়িত্ব

এটা নয় যে তাকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। আমি এখানে জাভাত্তিনির একটা কথা উল্লেখ করেছি। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে জাভাত্তিনির মতো সমাজসচেতন, শিল্পসচেতন এবং রাজনীতিসচেতন মানুষ আর দুটো আছে কি না সন্দেহ। তিনি বলেছেন—it is not my job to propound a solution। আমার কাজ হচ্ছে বিশ্লেষণ করা, বাস্তব অবস্থাকে বিশ্লেষণ করা, অবস্থাকে একটা সত্যিকারের perspective-এ এনে দাঁড় করানো। এবং বাকিটা দর্শকের দায়িত্ব। দর্শকের দায়িত্ব সেটাকে বোঝা এবং বুঝে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কোনও রাজনৈতিক thesis উপস্থাপিত করা রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব। ছবি করিয়ে-হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই বাস্তব অবস্থাকে, এই রাজনৈতিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করা, এই বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো, তীব্রভাবে বোঝানো, অত্যন্ত গভীরভাবে বোঝানো, সংবেদনশীল মন নিয়ে বোঝানো, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বোঝানো। এটাই আমাদের দায়িত্ব, এর বেশি কিছু নয়।

এতে কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে এটা inconclusive রয়ে গেল, অপরিপূর্ণ থেকে গেল। এবং সে কথাটাও জাভাত্তিনি আর এক জায়গায় বলেছেন: Life is inconclusive। শিল্পের ক্ষেত্রেও এটা তাই inconclusive। Open-ended কথাটা আমি মানি না। এখানে suggest করা হয়েছে, বোঝানো হয়েছে, প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র পথ হচ্ছে সমস্তরকম বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। আমাদের শত্রু কে মিত্র কে চিনে নেওয়াটাই আজকে যে কোনও সংগ্রামী মানুষের কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন, সবচেয়ে বড়ো উপলব্ধি।

প্রশ্ন: একাত্তরের পর আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সাম্প্রতিক এই দু'তিন বছরে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ আরও তীব্র হয়েছে, অত্যাচার আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। কাজেই এই মুহূর্তে বামপন্থী শিবিরের এই দুর্বলতাগুলো তুলে ধরাটা আপনার কাছে এত জরুরি হয়ে পড়ল কেন?

উত্তর: পৃথিবীতে একটিমাত্র পার্টি আছে যে পার্টি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে চিৎকার করে বলছে—we have nothing to hide, জনগণের কাছে আমাদের গোপন করার কিছু নেই। সে পার্টি হল কমিউনিস্ট পার্টি। সেজন্য আজ কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোনও কিছু গোপনীয়তা সর্বনাশের পথকে আরও প্রশস্ত করে দেয়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তখনই আরও জোরদার হয়ে ওঠে, আরও মারমুখী হয়ে ওঠে যখন বামপন্থী শক্তিগুলো ভেঙে তছনছ হয়ে যায় তাদের বিচ্ছিন্নতা বা তাদের sectarianism-এর দরুন। আমাদের ওপর তাই বেশি করে দায়িত্ব এসে পড়েছে যাতে আমরা আমাদের দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারি, আমাদের ত্রুটিগুলো মেরামত করে নিতে পারি, আরও বেশি করে সংঘবদ্ধ হতে পারি যাতে প্রতিক্রিয়াশীল

শক্তি আর মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে। এটা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়, আমাদের ভেতরের দুর্বলতা, আমাদের ক্লেদ-গলদ সবকিছু প্রকাশ্যে বলা দরকার, বলা দরকার সেই কথাগুলি যেগুলি আমরা মুখ ফুটে বলতে পারছি না, অনেক কিছুর ভয়ে, নেতৃত্বের ভয়ে, নানারকম হুমকির চাপে। কিন্তু এই কথাগুলো আমরা খোলাখুলি বলতে পারলে দেখতে পাব আমাদের কত বন্ধু কত মিত্র চারদিকে ছড়িয়ে আছে। তখন তাদের আমরা বুকে করে নিতে পারব। তখন প্রতিক্রিয়ার শক্তি পিছু হটবে, তাদের দাপট কমে যাবে। এবং সে-কারণেই আমি মনে করি এই মুহূর্তেই এই প্রশ্নটা আলোচনা করা, প্রকাশ্যে খোলাখুলি আলোচনা করা, পরিষ্কার করে চিৎকার আলোচনা করাটা বড়োই জরুরি, বড়োই প্রয়োজনীয়। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কুৎসা রটনা আর আত্মসমালোচনা—এই দুইয়ের মধ্যে ফারাক আকাশ জমিন। আত্মসমালোচনা করা হয় ভালোবাসা আর উত্তাপ দিয়ে, বাস্তবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, আর কুৎসা রটনার জন্ম কুৎসিত মতলববাজির মধ্যে।

প্রশ্ন: 'কলকাতা ৭১'-এর সাফল্য ছবি করার ব্যাপারে আপনাকে কীরকম সাহস জোগাচ্ছে? অর্থাৎ আপনি যা বলতে বা করতে চান politically বা অন্যভাবে, সেরকম ইচ্ছামতো ক্ষমতাগত সমস্ত কিছু করার প্রয়োজনীয় সাহস পাচ্ছেন কি?

উত্তর: আমি এ-পর্যন্ত ছবি করে যাচ্ছি এবং ছবি করতে পারছি। চার-পাঁচ বছর আগে ছবি করার যে অসুবিধাগুলি ছিল অর্থাৎ ছবিতে টাকা ঢালবেন এমন লোকজন পাওয়া যেত না, এখন তা নেই। অবস্থাটা এখন একটু পালটেছে, লোকজন পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে আগের চাইতে আমি একটু বেশি জনপ্রিয় হয়েছি। আমার নামে ছবি এখন কিছুটা চলে, সেটা দেখে তাঁরা আমাকে আজকাল একটু-আধটু ডাকছেন। কিন্তু একটা কথা তাঁরা বলতে চান আমি কেন একটা মিষ্টি ছবি করি না, কেন একটা romantic ছবি করি না। আর এ-সব মিছিল-বোমা-আন্দোলন নাই বা করলাম। আবার এটাও তাঁরা দেখছেন যে ছবি তো চলে একটু-আধটু, 'কলকাতা ৭১' যেমন চলেছে, 'ইন্টারভিউ' কলকাতায় না চললেও বাইরে বিক্রি যেমন হচ্ছে। তাঁরা দেখছেন ব্যাবসাটা জমেছে ভালো, তাই আমাকে ডাকেন, ছবি করতে বলেন। আবার ভয়ও আছে, ওই রাজনীতি কেন? এগুলো না এলেই ভালো।

কথাটা হচ্ছে, ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র শিল্পে যে পুঁজি নিয়োজিত হচ্ছে, তার রাজনৈতিক চেহারা এখনও খুব প্রকট নয়, এখনও তা দানা বাঁধেনি, যেমন আমেরিকায় ছিল একসময় অত্যন্ত প্রবলভাবে। একসময় সেই 'হলিউড টেন' কেস চলেছে, আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট নানাভাবে সমাজসচেতন শিল্পী, সমাজসচেতন কলাকুশলীদের হয়রানি করেছে, তাদের বরবাদ করে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে,

সূ চি প ত্র

প্র ব ন্ধ

একটি জীবনী ১১
ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ১৭
চলচ্চিত্রে সমকালীনতা ২৩
ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব ১৯৬৯ ২৮
চলচ্চিত্রে সংকট ও জনপ্রিয়তা ৩৪
দ্য গোল্ড রাশ ও চ্যাপলিন ৩৯
শিল্পীর সংগ্রাম—চ্যাপলিনের জীবন ৪৪
সিনেমার দর্শন ৫৭

সা ক্ষা ৎ কা র

প্রশ্নোত্তর : ১-৪ ৬৫

ছবিতে তাদের বয়কট করা হয়েছে। সে-সব এক ইতিহাস। ভারতবর্ষে সেটা এখনও আসেনি। খুব শিগগির আসবে বলে মনে হয় না। ভারতবর্ষে সামাজিক-রাজনৈতিক চেহারা সে-দিনের আমেরিকার থেকে আলাদা।

আমি যে ছবি করেছি বা করছি, সরকার তো তা জানেন। অবশ্য অনেকে বলতে পারেন এবং বলেনও, মৃণাল সেনের রাজনীতির ব্যাপারটা বুজরুকি। ও রাজনীতি সঠিক নয়। অবশ্য এঁদের মধ্যে দু'একজনকে আমি জানি যাঁরা বেঁচে আছেন কালো টাকার ওপর, যাঁরা বাড়ছেন কালো টাকা নিয়ে। তাঁরাও বলছেন মৃণাল সেনের রাজনীতিটা একটা বুজরুকি, সঠিক রাজনীতি নয়। আবার কেউ কেউ বলছেন: না, লোকটা সরকার বিরোধী ছবি করে। যে যাই বলুক, আমি এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করছি না। আমি তো ছবি করতে গিয়ে ব্যাংক থেকেও টাকা পেয়েছি। অর্থাৎ আমার মনে হয় চলচ্চিত্র শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের রাজনৈতিক চরিত্র এখনও সেভাবে আসেনি।

প্রশ্ন: কিন্তু সরকারের তো একটা রাজনৈতিক চরিত্র আছে?

উত্তর: নিশ্চয়ই আছে। আপনি আমাদের সরকারের কথা কী বলছেন? আমি আপনাকে বলছি আমেরিকান সরকারের কথা। আমেরিকান সরকার যে প্রচণ্ডরকম প্রতিক্রিয়াশীল, সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই। সম্প্রতি আমি যখন বার্লিনে গিয়েছিলাম তখন আমি প্রতিদিন দু'ঘণ্টা ভিডিয়ো প্রোগ্রাম দেখতাম, আমেরিকান প্রোগ্রাম, এবং সেখানে সমস্ত ছবি কী প্রচণ্ডরকম নিকসন বিরোধী তা ভাবা যায় না। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছি, আপনারা এত টাকা পান কোথা থেকে? ওঁরা বললেন যে ভিডিয়ো করতে তো বেশি খরচ নেই। আমি বললাম, তবু এই International network তৈরি করতে organisation-এর জন্যও তো টাকা লাগে। ওঁরা বললেন, টাকা New York State দেয়। New York State তাঁদের ছবি করতে টাকা দিচ্ছে। কী ছবি? প্রচণ্ডরকম নিকসন বিরোধী ছবি। নিকসন! আমেরিকার প্রধান পুরুষ, বহাল তবিয়তে যে ভদ্রলোক রাজত্ব চালিয়েছেন।

আপনি অবশ্যই লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর কথা ছেড়ে দিন, আপনি পোর্তুগালের কথা ছেড়ে দিন, গ্রিসের কথা ছেড়ে দিন, আপনি আফ্রিকার অনেকগুলো দেশের কথাও ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আরও সে-সব দেশের কথা যেখানে শাসন এবং গোটা ব্যবস্থাটা Openly tyrannical in the classic fascist style। কিন্তু বাকি দেশগুলোতে সরকার আজকাল অনেক বেশি sophisticated হচ্ছে, অনেক কিছু করতে দিচ্ছে, এবং কিছুদিন দেবেও। বুর্জোয়া সফিস্টিকেশনের মাহাত্ম্য এটা। হ্যাঁ, মাহাত্ম্যই বলব!

প্রশ্ন: আমাদের দেশে P.V.A. MISA, D.I.R এ-সব আছে, আবার আপনি বলছেন রাজনৈতিক ছবি করার স্বাধীনতা আছে, এটা কি তা হলে সরকারের দ্বৈত চরিত্র নয়?

উত্তর: হয়তো, আমি তো ছবিতে MISA-র কথাও বলতে পারি, পারি না? এ ছবিতে এ-কথাও বলেছি, স্ট্রাইক বিরোধী অর্ডন্যান্সের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেছে সাধারণ মানুষ। কেউ কোনও কথা তোলেনি, কোনও বাধা দেয়নি। আমি যদি না করে বলি, করা যায় না, আমিও করতে পারতাম, তবু করলাম না, তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়! 'পথের পাঁচালী'র পরেও শুনতাম অনেকে বলতেন, এক লক্ষ ফুট expose করলে আমরাও ওরকম ছবি করতে পারতাম। অথচ পঞ্চাশ লক্ষ ফুট expose করেও তাঁরা 'পথের পাঁচালী'র ধারে-কাছে আসতে পারতেন না। যে যখন ছবি করে তখন সে তার সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করেই করে। এ তো আর টাকা নয় যে সিন্দুকে রইল, মাঝে মাঝে দরকারমতো খরচ করব। সত্যজিৎ রায় নিজস্ব সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করে ১৯৫৫ সালে একটি ছবি করেছিলেন যার নাম 'পথের পাঁচালী', তা তিনি এক লক্ষ ফুট expose করুন আর পাঁচ লক্ষ ফুটই expose করুন। যা খুশি করুন, তিনি করেছেন এবং করে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা বলেন, রাজনৈতিক ছবি এখানে করা যায় না, তাঁরা ওটাও ও-কারণেই বলেন। ওঁরা হয়তো একটা justification খুঁজে বার করবেন, যুক্তি দাঁড় করাবেন: মৃণাল সেনের ছবি আবার রাজনৈতিক নাকি, ও তো একটা বুজরুকি। এটা যদি কেউ বলেন তাহলে আর কিছু বলা যাবে না, তাহলে আমি নাচার। কিন্তু একথা আমি বলব যে আমি সেন্সর বোর্ড থেকে এখনও অবধি কোনও বাধা পাইনি।

তবে কিছু গোলমাল আছে। একটা ছবি, ছবিটা এখনও আমি দেখতে পারিনি, ছবিটার নাম 'গরম হাওয়া'। ছবিটা করেছেন আমাদের এক বন্ধু, তাঁর নাম সাথ্যু, তিনি হায়দরবাদি। তিনি এ-ছবিতে একটা সহজ সত্য কথা বলেছেন, দেখিয়েছেন, দেশ বিভাগের পরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা, সেই অসহনীয় অবস্থা, যেন তাদের কোনও sense of belonging নেই, তারা যেন বাইরের লোক, outsider, এই কথাটা তিনি সরাসরি রেখেছেন, ছবিটা সম্পর্কে আমি চারদিক থেকে দারুণ প্রশংসাও শুনছি। ছবিটা অত্যন্ত disturbing, controversial-ও হয়তো। সেন্সর বোর্ডের একজন সদস্য, 'জাতীয়তাবাদী মুসলমান' ভদ্রলোক, ছবিটা সম্পর্কে আপত্তি তুলে বসলেন, তাঁর জাতীয়তাবোধ হঠাৎ জেগে উঠল, তিনি বললেন ছবিটি নাকি 'Anti Indian'। আমার মনে হয় Ministry of Information and Broadcasting ছবিটা ছেড়ে দেবে। এ-সব বলার scope আজ হচ্ছে, দশ বছর আগে যা ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি কথাটা কোথাও থাকলে আগে সেন্সর বোর্ড তা কেটে

দিত, এখন আর দেয় না। সেটা হয়তো হবে পরে, হতে পারে, কিন্তু এখন আপাতত হচ্ছে না।

প্রশ্ন: আপনার 'পদাতিক' ছবি কি সম্পূর্ণ শহরভিত্তিক এবং মধ্যবিত্ত চরিত্র নিয়ে?

উত্তর: হ্যাঁ, মোটামুটি তাই। মিছিল আছে, ট্রেড ইউনিয়ন মিছিল, যেখানে মজুরদের ছবিও দেখা যাবে। গ্রাম নেই ছবিতে। তবে আমরা বৃহত্তর পরিবেশে চলে গেছি। ভিয়েতনাম, মোজাম্বিক, আর্জেন্টিনায় যে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছে সেখানকার লড়াই, সেখানকার সংগ্রামের কথাও আছে। লড়াই চলছে সে-সব জায়গাতে, সেই একই কারণে, সমাজটাকে বাসযোগ্য করার জন্য, সুন্দরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

---

* এই রচনার ঠিক দু'বছর পরেই Emergency এল, সরকারের আপাত সহনশীলতা উড়ে গেল দিল্লির মসনদের অঙ্গুলিহেলনে, সবকিছু পালটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। বোঝা গেল, আমাদের সরকার এতদিন যে ব্যবস্থা চালাচ্ছিলেন—অর্থাৎ repressive tolerance (কথাটা আমি এক পশ্চিম ইউরোপীয় রাজপুরুষের মুখে শুনেছিলাম)—তা সেই মুহূর্তে বাতিল হয়ে গেল। এতদিন যা চলছিল জেলের ভেতরে, পুলিশ স্টেশনের ঘরে এবং প্রকাশ্যে নানা দৌরাত্ম্য যা চলছিল বেআইনিভাবে, তাই তখন ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র, ভয়ংকর হয়ে উঠল, আইন আর অর্ডন্যান্সের দাপটে।

প্রশ্নোত্তর : ৪

প্রশ্ন: 'ইন্টারভিউ', 'কলকাতা ৭১' এবং 'পদাতিক'—এই তিনটি ছবি মিলিয়ে এক ট্রিলজি গড়ে উঠেছে বলে আপনি বলে থাকেন। এই ট্রিলজির মূল সুর কী? এর তাত্ত্বিক ভিত্তিই বা কী?

উত্তর: আমি বোধহয় আগেও আপনাদের বলেছি, আবার বলছি যে 'ইন্টারভিউ' থেকে 'পদাতিক' এই তিনটি ছবিতেই পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে কলকাতা। কলকাতা এই তিনটি ছবিতে শারীরিকভাবে উপস্থিত আগাগোড়া। কিন্তু তিনটি ছবিতেই, অন্তত আমি এইভাবেই দেখেছি, কলকাতার শারীরিক উপস্থিতি এসেছে নেহাতই একটা excuse হিসেবে। চেষ্টা করেছি কলকাতার এই উপস্থিতির মধ্য দিয়ে গোটা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেহারার আন্দাজ পাওয়ার, বিশ্লেষণ করার এবং ব্যাখ্যা করার এবং ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে দেশের এই realityকে এক সঠিক perspective-এ এনে দাঁড় করানোর। এই চেষ্টাই করেছি এই তিনটে ছবিতে এবং এই চেষ্টার মধ্যেই তিনটি ছবির মূল সুর ও তাত্ত্বিক ভিত্তির খোঁজ পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

তবে হ্যাঁ, আমাদের ব্যাখ্যা নিয়ে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে—যা আমাদের তিনটি ছবিতেই ধরা পড়েছে নানাভাবে—এইসব নিয়ে দর্শকমহলে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যে সিদ্ধান্তকে সঠিক মনে করেছি, কেউ সেই সিদ্ধান্ত বা চিন্তার সঙ্গে একমত হয়েছেন, কেউ বা ঘোরতর আপত্তি তুলেছেন, আবার কেউ মারমুখী হয়ে উঠেছেন। এবং তা হবেই, হতে বাধ্য। মার্কস এঙ্গেলস লেনিনের নামে একই দেশে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রশ্নে যদি এক ডজন দল গড়ে উঠতে পারে তাহলে আমাদের মতো ছবি-করিয়ের দলের ভাবনাচিন্তায় দেশের সমস্ত মানুষ একমত হবেন এটা আশা করা বাস্তব অবস্থাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা। বরং আমাদের কোনো ছবি যদি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বা সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে কোনো তর্ক তুলতে পারে, তাহলে বলব ছবি করিয়ে হিসেবে আমাদের চেষ্টা সার্থক।

প্রশ্ন: আমাদের দেশে যে শিল্পকর্মী socio-political reality-কে বিশ্লেষণ করতে চান, ব্যাখ্যা করতে চান, তাঁর কাছে কি এই ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণই যথেষ্ট? এই বিশ্লেষণকে ভিত্তি করে যে সিদ্ধান্তের উৎপত্তি সেই সিদ্ধান্তকে শিল্পের মাধ্যমে প্রয়োগ করার ব্যাপারে সেই শিল্পকর্মীর দায়িত্ব কি জরুরি হয়ে পড়ে না?

উত্তর: কথা হচ্ছে, বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা কে করছেন? এবং কীসের ভিত্তিতে? এখানে, আমাদের ছবিতে, এই কাজটা করছি আমরা এবং তা করছি আমাদের বিশ্বাস ও বোধের ভিত্তিতে। শুধুমাত্র শারীরিকভাবে বাস্তব অবস্থানকে ছবির পর্দায় দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করাটাই কি আমাদের দায়িত্ব? মোটেই না। আমাদের দায়িত্ব আগেও বলেছি, আবার বলছি—শারীরিক বাস্তবকে অর্থাৎ physical reality-কে প্রায় আক্ষরিক অর্থেই রীতিমতো partisan করে তোলা। এবং তা করব আমাদের বিশ্বাস ও বোধের ভিত্তিতে। আমি একেবারেই মনে করি না যে আমার পারিপার্শ্বিক রং-চং-চরিত্র বর্জিত এক শরীর-সর্বস্ব জড় পদার্থ বা অবস্থা। হয়তো আপাতদৃষ্টিতে তাই। যে-মুহূর্তে আমি সেই পদার্থ বা অবস্থানটিকে তুলে ধরছি সেই মুহূর্তে আমি আমার বোধ ও বিশ্বাস দিয়ে তার ওপর একটা চরিত্র আরোপ করছি, তাকে 'দলীয়' করে তুলছি, তাকে partisan করে তুলছি। তথাকথিত 'বিশুদ্ধ' করে চিন্তার কারবারীরা আমার এই কথায় ঘোরতর আপত্তি তুলবেন নিশ্চয়ই, আমাকে অর্বাচীন বলে সোরগোল তুলবেন অবশ্যই। কিন্তু আমিও তারস্বরে বলবার চেষ্টা করবোঃ যখন সেই বিশুদ্ধবাদীরা এইসব করছেন তখন তাঁদেরও আপ্রাণ চেষ্টা চলছে বাস্তব নামক অবস্থানটিকে তাঁদের মনের মতো করে সাজানো।

যাই হোক, আপনাদের প্রশ্নের জবাবে আমার কথা: বাস্তব অবস্থা, সমস্ত রকম বাস্তব অবস্থাতেই partisan হতে বাধ্য এবং তা নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যাকারের partisan দৃষ্টিভঙ্গি ওপর। এবং ব্যাখ্যাকারের উপস্থাপনার মধ্যেই যে সিদ্ধান্তের ছিটেফোঁটা উঁকি দেয় এবং অল্পবিস্তর শারীরিকতা নিয়েই ধরা পড়ে তা কি আপনারা অস্বীকার করতে পারেন? শিল্পকর্মীর দায়িত্ব সর্বক্ষেত্রেই অসীম। সেই দায়িত্ব শিল্পকর্মী কখনওই এড়াতে পারেন না। তবে, কোন শিল্পকর্মে কীভাবে তিনি সেই সামাজিক দায়িত্ব পালন করবেন তা তাঁর ব্যক্তিগত রুচি ও বিশ্বাসের ওপরই নির্ভর করবে। 'ইন্টারভিউ'-তে যা আমরা করেছি, 'কলকাতা ৭১'-এর উপস্থাপনা তা থেকে অবশ্যই আলাদা এবং 'পদাতিক'-এর বিশ্লেষণ আরও অন্য খাতে। কিন্তু তিনটি ছবিকেই আমরা দাঁড় করিয়েছি আমাদের পারিপার্শ্বিক ভিত্তি করে এবং সেই ভিত্তির ওপর চরিত্র আরোপ করেছি আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে এবং তিনটিকেই আমরা তিনটি খাঁচায় বেঁধেছি আমাদের শিল্পবোধ দিয়ে। কোথাও কখনও প্রয়োজনবোধে ও বক্তব্য

প্রকাশের তাগিদে উঁচু পর্দায় চেঁচিয়েছি, কোথাও বা পরোক্ষে কোনও মন্তব্য করেছি, কিন্তু সবসময়েই আমাদের নীতির প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছি বলে মনে করি না। আমরা মনে করি সমস্ত শিল্পই কিঞ্চিদধিক tendencious হতে বাধ্য, কিন্তু তা কোন শিল্পকর্মে কতখানি হবে তা নির্ভর করে শিল্পকর্মীর নিজস্ব logic-এর ওপর। সিদ্ধান্তের প্রশ্নে, অতএব, আপনাদের সঙ্গে আমার মতের কোনও ফারাক নেই।

প্রশ্ন: পদাতিক ছবিতে এই সিদ্ধান্ত হয়তো এই যে আজকের দিনে সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরি। আমাদের মনে হয়েছে, 'পদাতিক'-এ এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা middle-class romanticism-এ আক্রান্ত। মায়ের মৃতদেহ, একপাশে ছেলে, অন্যদিকে বাবা—এ-ছবির আগের পর্বে কাহিনির রাজনৈতিক বিশ্লেষণের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের পর্ব সংগতিহীন, আরোপিত ও রোমান্টিক বলে মনে হয়। আপনার বক্তব্য?

উত্তর: মাফ করবেন, আপনাদের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। রোমান্টিক বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন আমি জানি না। আমি এইটুকু জানি যে কোনও dedicated রাজনৈতিক কর্মী যখন তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিছু জরুরি প্রশ্ন তুলে ধরেন নেতৃত্বের কাছে এবং যখন সর্বশক্তিমান নেতৃত্ব যুক্তির জোরে না পেরে হুমকি দিয়ে সেই প্রশ্নগুলোকে বাতিল করে দিয়ে থাকেন এবং দরকারমতো প্রশ্নকারীকে নানাভাবে জব্দ করতে কোমর বাঁধেন, তখন সেই কর্মী তাঁর বন্দিদশায় নিভৃতে, একান্তে তাঁর মায়ের কথা ভাবেন, তাঁর বাবার কথা, ভাইবোনের কথা, প্রিয়জনের কথা, তাঁর ছেলেবেলার কথা, শৈশব-কৈশোরের কথা। এগুলোকে আপনি কি middle-class romanticism বলবেন?

'পদাতিক'-এ কী দেখেছেন? দেখেছেন, একদিকে পুলিশের হামলা, অন্যদিকে নেতৃত্বের হুমকিতে sandwitched সুমিত। অবশ্যই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। বন্দিদশা সুমিতের। গৃহকর্ত্রী, যাঁর রাজনৈতিক চেতনা সম্পর্কে আমরা, ছবি-করিয়েরা, মোটেই উৎসাহিত নই, বললেন: "আপনি কিন্তু এখানে থাকতে পারেন।" অত্যন্ত ভদ্রভাবেই সুমিত সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে এবং আরও একটি প্রশ্নের জবাবে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই জানায় যে পার্টি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আরও বলে, পার্টিকর্মীর দায়িত্ব লড়াই করা—প্রতিমুহূর্তে—ভেতরে ও বাইরে। অর্থাৎ বিশেষ মুহূর্তে নেতৃত্বে সম্পর্কে অকাট্য যুক্তি দিয়ে সুমিত একদিকে প্রশ্ন তুলছে, অন্যদিকে পার্টির প্রতি গভীর আস্থা, অচঞ্চল বিশ্বাসের কথা জানিয়ে দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই তার মনে। এই অবস্থায়, সুমিত তার মায়ের খবর পায়। সেখানে যাওয়াটা সুমিতের এই অবস্থায় উচিত হবে কি না

তা ভাবে এবং শেষ পর্যন্ত যাওয়ার তাগিদটা প্রচণ্ডভাবে অনুভব করে। গিয়ে দেখে: ছিটিয়ে-ছড়িয়ে রয়েছেন আত্মীয়-পাড়াপ্রতিবেশী। দেখে, মায়ের মৃতদেহের ওপর পড়ে ছোটো ভাই কাঁদছে, বাপ পাথরের মতো বসে আছেন ঘরের বাইরে, আর উৎসুক বুড়োরা সুমিতের খবর জানতে চাইছে।

আরও কী দেখেছেন আপনারা? দেখেছেন, বাবা বুঝতে পারছেন সুমিত এসে বোধহয় তার বিপদটাই ডেকে আনল। তাই বুড়ো প্রশ্নকারীদের খপ্পর থেকে সুমিতকে সরিয়ে আনতে এগিয়ে যান বাবা, পাশের ঘরে নিয়ে আসেন, নিভৃতে দু-একটা কথা বলার মধ্য দিয়ে পিতা-পুত্রের মধ্যে সেতু তৈরি হয়। এ-সবকে আপনারা middle class romanticism বলছেন? আমি জিজ্ঞাসা করি: মানুষ নিয়েই তো রাজনীতি? নয় কি?

আরও কী দেখেছেন? শুনেছেন, হঠাৎ বাইরে গাড়ির আওয়াজ। তবে কি পুলিশের গাড়ি চলে এল? বাবা তাড়াতাড়ি ছেলেকে সরিয়ে দিতে ব্যস্ত। হঠাৎ, ছাড়াছাড়ির মুখে, বাবা আর লোভ সামলাতে পারেন না। বাবা বলতে চান, বোঝাতে চান যে এই বুড়ো হাড়েও, এই হাঁপ ধরা কলজেতেও তিনি শত্রুকে ঘৃণা করতে জানেন। তিনি জানান, অফিসের মুচলেকাপত্রে তিনি সই করেননি।

এটাকে, এই মুহূর্তটিকে, আপনারা middle class romanticism বলবেন? সেই মুহূর্তে কি আপনাদের মনে পড়ে না মাওৎ-সে-তুং-এর ১৯২৬ সালের সেই উক্তি:

হয়তো আপনাদের মনে আছে, মাওৎ-সে-তুং-এর এই উদ্ধৃতিটি আমরা পদাতিক-এর এক জায়গায় তুলে ধরেছি। এবং আমি বলছি, আপনারাও আপনাদের প্রশ্নে সে কথা বলেছেন যে এই সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনের কথাটাই আমরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলবার চেষ্টা করেছি পদাতিক ছবিতে। আজকের রাজনীতিতে, আজকের সামাজিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের চরম মুহূর্তে, আজকের পারস্পরিক লাঠালাঠির পরিপ্রেক্ষিতে সংঘবদ্ধতার জন্য সক্রিয় চেষ্টাই আজকের প্রতিটি সচেতন মানুষের নৈতিক রাজনৈতিক দায়িত্ব।

একটা কথা, আপনারা প্রশ্ন না করলেও উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। 'পদাতিক'-এর শেষের দিকের সেই দৃশ্য—যেখানে বিমান নামে ছেলেটি এসে সুমিতকে জানায় যে তার মা ভয়ানক অসুস্থ, সুমিতকে দেখতে চান। খবরটা জানিয়ে বিমান চলে যায়, কারণ সুমিতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা পার্টির নেতৃত্ব চায় না। এই দৃশ্যটি সম্পর্কে পরিষ্কার প্রতিক্রিয়া আমি পেয়েছি। এটা এসেছে এক অত্যন্ত জ্ঞানী ও অতি প্রবীণ মার্কসবাদীর কাছ থেকে, আর

একটি বিভ্রান্ত অথচ সঠিক পথে আসার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহী একজন সৎ যুবকের কাছ থেকে। প্রবীণ মার্কসবাদীর মতে ছবিটি সর্বাঙ্গসুন্দর ও প্রচণ্ড বাস্তবানুগ হয়ে ওঠা সত্ত্বেও সামান্য একটু খুঁৎ থেকে গেছে এই দৃশ্যে। যদি দেখানো হত বিমানের এই বাড়িতে আসাটা এবং খবর দেওয়াটা পার্টি নেতৃত্বেরই যোগসাজশে হয়েছে এবং এই ব্যবস্থাটি সুমিতকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্যই সংগঠিত হয়েছে তাহলে নাকি দারুণ হত! অর্থাৎ সুমিত মাকে দেখতে বেরিয়ে আসতেই যদি তাকে খতম করা হোত। অর্থাৎ 'খতম' নামক রাজনীতির একটা পরিষ্কার চেহারা ফুটে উঠত। সে-যুগের ঐতিহাসিকতা নাকি তাহলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া এসেছে যে-যুবকটির কাছ থেকে, সেই যুবকটির চোখে, আমাকে যুবকটি সে-কথাই বলেছে, বিমানের মুখে মায়ের খবর শুনতেই সুমিতের সঙ্গে সঙ্গে দর্শক-যুবকটিরও ভেতরটা শুকিয়ে গিয়েছিল। এটা কি সত্যিই তাই? না, সুমিতকে ফাঁদে ফেলবার একটা কৌশলমাত্র? যুবকটিরই ভাষায়: বিমান যখন বলল আপনার মা অসুস্থ এবং বলেই চলে গেল, তখন আমার মনে হল আমি চোখ বন্ধ করি, এ-দৃশ্য আমি দেখব না, দেখতে চাই না। তারপর দেখলাম, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম! মনে হল, কী অসাধারণ মুহূর্ত। মনে হল, ভবিষ্যৎ হারিয়ে যায়নি, এখনও লড়াই করতে পারব, চলব, এগোব।...

এই দুটো পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়ার কথা মাথায় রেখে মনে পড়ে কোনও এক বিদেশি সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে আমি বলেছিলাম:

> The line between slander and self-criticism is a very thin line. It is almost like tight-rope walking. While making PADATIK we .were aware of this line of demarcation...

ওপরের দুটো প্রতিক্রিয়া এবং slander ও self criticism সম্পর্কে আমার বক্তব্য দুটো পাশাপাশি রেখে আশা কবি আপনারা পদাতিককে বিচার করবেন।

প্রশ্ন: আমাদের যেটা মনে হয়েছে, সেটা হল পদাতিক-এর ছেলেটিকে আপনি এক নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে এমন এক পরিবেশে নিয়ে গেছেন, সেটা যেন Indian reality-র বাইরে একটা দ্বীপ। এবং সেখানে শীলা মিত্র জাতীয় ফ্যাশনেবল মহিলার যন্ত্রণা, নারী মুক্তি ইত্যাদির প্রশ্ন ঠিক মেলে না। আপনার মত?

উত্তর: ঘটনাটি Indian reality-র বাইরে এ-কথা বলব না। এবং নারী মুক্তির কথা যেভাবে ছবিতে এসেছে, সেটা ঠিক মেলে কি মেলে না তাও matter of opinion। তবে হ্যাঁ, সুমিতকে যদি কোনও নিম্নবিত্ত ঘরে বা চাষি বা মজুরের পরিবারে তুলে নেওয়া হত তাহলে হয়তো বক্তব্যটি আর একটি বাড়তি dimension পেতে পারত। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। কিন্তু যখন দেখি প্রাসাদোপম

বৃদ্ধির অন্তরালায় সুস্মিতকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য অনেকেই প্রায় মারমুখী হয়ে ওঠেন আমার ওপর, তখন প্রচণ্ড জেদ চাপে আমার, অকারণ জেদ, ভাবি—যা করেছি ঠিক করেছি।

প্রশ্ন: এবার আপনার 'কোরাস'-এ চলে আসছি। আপনার বর্তমান ছবি। 'কোরাস' নামের সার্থকতা কী? আক্ষরিক অর্থে তো a group of people, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে যারা মিলিত (গ্রিক অর্থে), সেখান থেকে extend করে আজকের যুগের সাধারণ মানুষই কি কোরাস? যদি তাই হয়, কীভাবে তা মিলিয়েছেন? আজকের কোরাস কী বলতে চাইছে? কোন বিশেষ অর্থে তারা মিলিত?

উত্তর: আক্ষরিক অর্থ থেকেই শুরু করুন না কেন? নানা অর্থে 'কোরাস' এই ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে। নানাভাবে। এবং আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে বহুল ব্যবহারের ফলে শব্দটা রীতিমতো আটপৌরে হয়ে দাঁড়িয়েছে। অ্যাকাডেমিক অর্থে কোরাস গ্রিক নাটকের সেই চরিত্র যে বা যারা বিশেষ মুহূর্তে এসে দাঁড়ায় মঞ্চের ওপর এবং ভাষ্যকারের ভূমিকা পালন করে চলে যায়। অথবা আমাদের ট্র্যাডিশনাল নাটকের সূত্রধারের মতো খানিকটা। এবং ধরুন, সমবেত সংগীতের অংশীদার। কিংবা ঐকতান। ইত্যাদি। এক কথায়: 'কোরাস' আমাদের ছবিতে শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ায় একটি ব্যাপক অর্থে—বিশাল মানুষের এক বিশাল ইচ্ছা—বিস্তর মানুষ, অনেক কথা, বহু লড়াই, সব যখন একীভূত হয়ে যায়, একটা সাংগীতিক মুহূর্তের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ একটা collective আবেগ বা ইচ্ছা—তারই নাম 'কোরাস'।

প্রশ্ন: 'কোরাস' নামে থিয়েটারের গন্ধ পাচ্ছি। জানতে ইচ্ছে করছে, এই ছবির প্রকাশভঙ্গি কি খানিকটা theatrical? না, কথাটা শুধু subjective অর্থেই ব্যবহার করেছেন? যদি theatrical করে থাকেন তো বলব সেটি একটি স্বতন্ত্র art-medium। এ-ক্ষেত্রে সেটি কি film medium-এর পরিপূরক হয়েছে?

উত্তর: আপনাদের মূল প্রশ্ন, মনে হচ্ছে: flim একটি স্বতন্ত্র আর্ট ফর্ম, তার সঙ্গে থিয়েটারকে মেলান কীভাবে। আমি বলব, রীতিমতো চেঁচিয়েই বলব, শিল্পের রাজ্যে আমি জাতি বিচার করতে নারাজ, ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক আমার নেই, স্বাতন্ত্র্যের ঢ্যারা কেটে আর কৌলীন্যের মুখোশ চাপিয়ে তথাকথিত 'বিশুদ্ধবাদী'দের ঘোঁয়াটে কূটতর্কে আমার আস্থা নেই এতটুকু। আমি মনে করি প্রতিটি আর্ট ফর্মেরই একমাত্র সামাজিক ও শিল্পগত ব্যাখ্যা হল বক্তব্য প্রকাশ করা, কমিউনিকেট করা। আপনার হাতিয়ারের ওপর নির্ভর করে এবং প্রয়োজন হলে বাইরে থেকে আরও একাধিক হাতিয়ার আমদানি করে communicator-এর ভূমিকা যথাযথ পালন করাটাই আপনার প্রধান দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি

'বিশুদ্ধবাদী'দের চোখে জাতিচ্যুত হয়ে যান তো জাত খোয়ানোটাই আপনার পবিত্রতম দায়িত্ব বলে মনে করবেন। গোঁড়া টিকিধারী পণ্ডিতেরা ও তকমা-আঁটা মোল্লারা, আপনারা জানেন, নানা ভাবে নানা সময়ে সমাজের অগ্রগতিকে বাধা দিয়েছেন। শিল্পের ক্ষেত্রেও এই সমস্ত মোল্লা-পণ্ডিতদের প্রভাব থেকে দূরে সরে দাঁড়ানোটাই আমি সবচাইতে বাঞ্ছনীয় মনে করি। এটা আমি একটি পবিত্র সামাজিক দায়িত্ব বলে মনে করি। এবং মনে রাখবেন, শিল্পকর্ম নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া।

আজকের যুগে, যেখানে বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে প্রচণ্ড বেগে, যেখানে সে দিনের সেই গ্যাগারিন-এর ঘটনা থেকে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান যে অসাধ্য সাধন করে যাচ্ছে, সেখানে আমরা সবাই এবং আমাদের সবকিছুই জাতি-চিহ্ন-কৌলীন্যর বাইরে। এবং শিল্পের ক্ষেত্রে আমি প্রতিমুহূর্তেই একটা cross-fertilisation-এর বিরাট কর্মযজ্ঞের চেহারা দেখতে পাচ্ছি। এবং সেখানে দেখছি ফিল্ম ও থিয়েটার নামক দু'টি প্রতিবেশী আর্ট ফর্মের অবাধ মেলামেশা, অকুণ্ঠ ঢলাঢলি। এই ঢলাঢলির মধ্যে আমি থাকতে চাই, থাকতে চাই সামাজিক মানুষ হিসেবে, ছবি-করিয়ে হিসেবে। কোরাস অবশ্যই একটি ছবি। কিন্তু হ্যাঁ, এই ছবিতে আমরা থিয়েটারকেও এনেছি, এনেছি বক্তব্যকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য। এবং তা করতে গিয়ে এক বিরাট শিল্পগ্রাহ্য অভিজ্ঞতার আন্দাজ পেয়েছি।

থিয়েটারের দিকে একবার তাকান। দেখুন, ব্রেখ্‌ট্‌কে। দেখুন, কনভেনশনাল থিয়েটারকে ভেঙে ব্রেখ্‌ট্ কী অসাধ্য সাধন করেছেন, পুরোনো ঐতিহ্যকে বাতিল করে নয়, ঐতিহ্যর প্রতি বিশ্বাস রেখেই।

দেখুন, Peter Weiss-কে যিনি তাঁর Discourse on Vietnam বা Investigation বা Trotsky in Exile বা তাঁর সাম্প্রতিকতম জেহাদ অর্থাৎ Guerrilla theatre-এর concept নিয়ে থিয়েটারের রাজ্যে কী বিশাল তোলপাড় তুলছেন। দেখুন, তাঁর নাটকে স্লোগান কীভাবে কী কায়দায় কথ্য সংলাপ হয়ে উঠতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত কবিতার স্তরে উত্তরণ ঘটতে পারে।

আরও দেখুন হোকথ্-র 'Deputy' নামক নাটকটি। দেখুন, পাহাড়প্রমাণ রাজনৈতিক দলিল কীভাবে নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারে।

ছবির রাজ্যে চোখ ফেরান। যাঁরা, যে-বিশুদ্ধবাদীরা, এতদিন বলে এসেছেন ফিল্ম একটি ভিসুয়াল (visual) আর্ট, এবং এই ফতোয়ার দোহাই পেড়ে যাঁরা একদিন চ্যাপলিনের অসাধারণ শিল্পকীর্তি Great Dictator-কে বাতিল করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন, তাঁরা এখনও দেখেও দেখবেন না হয়তো,

ঠেকেও শিখবেন না যে ফিল্‌ম আজকের দিনে যতখানি visual, হয়তো প্রায় ততখানিই aural হতে চলেছে। নাম করে লাভ নেই। কারণ ভূরি ভূরি নাম বলা যায়—আন্তর্জাতিক আসরে যে-সব ছবি দেখে একদিকে দৃশ্যবস্তুর প্রসাদগুণে মুগ্ধ হতে হয়, অন্যদিকে সর্বক্ষণ কানে শুনতে পাওয়া যায় কথা, সংলাপ, শব্দ, এককথায় রসঘন literary exercise।

সে দিন ইতালিয়ান ফিল্‌ম ফেস্টিভ্যালে, শুনলাম এক ফিল্‌ম সোসাইটির জনৈক বুদ্ধিমান দর্শক এবং শিল্প সমালোচক রোসিলিনি-র এক ছবি 'The Love', অ্যানা মানিয়ানি-কে নিয়ে, দেখে নাকি ভয়ানক বিরক্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন বলে শোনা যায়: এ তো নাটক দেখলেই হত, এ নিয়ে ছবি কেন? ভদ্রলোকের উষ্মার কারণ: ছবিতে শুধুই অ্যানা মানিয়ানি এবং একটু সময়ের জন্য একটা বেড়াল এবং ছবি জুড়ে শুধু ভদ্রমহিলারই কথা। ভদ্রলোক ছবি দেখে 'বেজাতের' শিল্পের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়িতে রুষ্ট হয়েছেন। তাই ছবিঘর থেকে বেরোতেই গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিজেকে শুদ্ধিকরণের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।

কিন্তু, একটা কথা। এ-যুগে, যেখানে সবকিছুই এগোচ্ছে বিজ্ঞানের তীব্র বেগে, সেখানে কারও জাত আর থাকবে না। এবং এটাই সবদিক থেকেই কাম্য।

হ্যাঁ, আমাদের ছবিতে, কোরাস-এ থিয়েটারও আছে বলে আমরা মনে করি। থিয়েটার এবং আরও কিছু।

আমার সিনেমার জীবনে 'কোরাস' বাস্তবিকই একটি মস্ত সিনেমাটিক অভিজ্ঞতা।

প্রশ্ন: বিজ্ঞাপন মারফত আমরা জেনেছি, 'কোরাস' একটি আধুনিক ফ্যান্টাসি। আর্ট ফর্ম হিসেবে আলাদা একটা dimension যাতে পায় এ-কারণে কি ফ্যান্টাসি করতে চেয়েছেন? না, বক্তব্যকে সোচ্চার করে তোলার সহায়ক হিসেবে এটা করা হয়েছে?

উত্তর: ব্রিটিশ পরিচালক লিন্ডসে অ্যান্ডারসন-এর 'IF' ছবিটি নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন। ওই ছবি প্রসঙ্গে লিন্ডসে অ্যান্ডারসন আমাকে একবার লিখেছিলেন:

'কোরাস'-এ একটি ইচ্ছাপূরণ-এর ব্যাপার আছে। ওটা ফ্যান্টাসির স্তরে রাখাটা শিল্পগত ও অন্যান্য ব্যাবহারিক কারণে প্রয়োজন মনে করেছি। এবং লিন্ডসে অ্যান্ডারসন-এর কথামতো অপেক্ষা করে রয়েছি, দেখছি ওই ব্যাপারটা আগামী দিনের reality হয় কি না!

তবে, 'কোরাস'-এ শুধুই ফ্যান্টাসি নেই। এখানে ফ্যান্টাসি ও বাস্তবের যথেষ্ট

আনাগোনা রয়েছে, একটি অপরটির মধ্যে ঢুকে পড়ছে অবাধে, খুশিমতো এবং অবশ্যই প্রয়োজনমতো।

অর্থাৎ এখানেও বিশুদ্ধবাদীদের জাত যাওয়ার একটা ভয় থেকে যাচ্ছে। ছবি দেখুন, দেখে বিচার করুন ফ্যান্টাসি ও বাস্তবের এই অবাধ মেলামেশাটা শিল্পসম্মত হয়েছে কি না এবং সর্বোপরি তাৎপর্য পেয়েছে কি না।

এককথায়, আবার বলছি, কোরাস আমাদের ছবির জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা।

একটি জীবনী

সিনেমার কাগজে জীবনীর ছড়াছড়ি। রকমারি জীবন, রকমারি 'জীবনী'। পাঠকের তাগিদ, সম্পাদকের হুকুম। আর সেই তাগিদ মেটাতে আর হুকুম তামিল করতে কলম শানিয়ে আর বুদ্ধি বাগিয়ে পাঠক-নির্দেশিত ঠিকানায় 'জীবনী'র তথ্য সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়েন সিনেমার সাংবাদিক—তারকা-জীবনের ভাষ্যকার, জীবনীকার। কয়েক কাপ চা কফি আর ঠান্ডা শরবতের পরিবেশন এবং আলাপচারী তারকার মিষ্টভাষণ—সবকিছুর মধ্যে সাংবাদিক-জীবনীকারের চোখ, কান ও মন সদাজাগ্রত, সতর্ক। কাজ গুছিয়েই সোজা দফতখানা। পুরো 'জীবনী' বেরিয়ে আসে কিছুক্ষণের ভেতরেই—খানিকটা রিপোর্টাজ, খানিকটা উপন্যাস আর বাকিটা রূপকথার ধাঁচে এক অতি-কাব্যিক বিন্যাস। একটা গোটা জীবনী। শুভ জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে স্বপ্ন-ঠাসা কৈশোরের মধ্য দিয়ে সিনেমা-রাজ্যে প্রথম ছাড়পত্র পাওয়ার এবং তারপর ধীরে ধীরে অথবা হঠাৎ আচমকা দুরন্তভাবে তারকায়িত হওয়ার লম্বা ইতিহাস।

এবং উপসংহারে সিনেমা-রাজ্যের বাইরে প্রাত্যহিক জীবনে ভালো লাগা না-লাগার লম্বা ফিরিস্তি—কোন রংটা ভারি মিষ্টি, কোনটা খেতে ভারি মজা, কোন বইটা পড়তে ভালো ইত্যাদি। পাঠক মুহ্যমান, সম্পাদক খুশি আর সাংবাদিক-জীবনীকার নতুন উদ্যমে নতুন জীবন-এর খোঁজে ভ্রাম্যমাণ।

আমি একজন সিনেমার কারবারি। আমার ডাইনে-বাঁয়ে, ওপরে-নীচে, আশপাশে সর্বত্র সিনেমা। সিনেমায় জড়িয়ে আছি আষ্টেপৃষ্ঠে। একটি 'জীবনী'র সন্ধান আমিও পেয়েছি। সেই জীবনী আমি লিখতে বসেছি।

তখনও তার অস্তিত্ব জানা যায়নি। জানা গেল তখন, যখন সিনেমা জন্মাল। অর্থাৎ সিনেমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার জন্ম। ১৮৯৫ সাল। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত সে বেড়েই চলেছে, এগিয়েই চলেছে—ঠিক তেমন বাড়ছে, ঠিক যেমনটি এগোচ্ছে সিনেমা। নানা উঠতি-পড়তির মধ্য দিয়ে নানা চড়াই-উতরাই ডিঙিয়ে এক বিস্তৃত অসমতল পথ বেয়ে আজ সে এক বিশিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে—ঠিক যেমনটি ঘটেছে সিনেমার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ সিনেমাব সঙ্গে এর

যেন নাড়ির সম্পর্ক, দুইয়ের কেউই একে অপরকে ছেড়ে চলতে শেখেনি যেন। ১৮৯৫ সালে সেই যে এদের যুগলযাত্রা শুরু হল, আর ছাড়াছাড়ি হয়নি আজ পর্যন্ত—সেই থেকে এগিয়েই চলেছে পথ পরিক্রমায়। কখনও গতি মন্থর হয়েছে, কখনও দ্রুত চলেছে, কখনও বা হোঁচট খেয়েছে, খুঁড়িয়ে চলেছে—কিন্তু চলেছেই সেই শুরু থেকে। চলার বিরাম নেই এদের; কারণ চলাই এদের ধর্ম—সিনেমার এবং তার, যার জীবনী লিখতে বসেছি।

সে দর্শক। সিনেমার দর্শক। সিনেমার সঙ্গে সঙ্গে যার জন্ম। এবং সিনেমার সঙ্গে যার বুদ্ধিবৃত্তি, সম্পদ বেড়েই চলেছে প্রতি পদক্ষেপে। জীবনে যার স্থবিরত্ব আসবে না কখনও। সিনেমার সঙ্গে সঙ্গে ভাণ্ডার যার বেড়েই চলবে, মনোরাজ্যের বিকাশ ঘটবে দিনের পর দিন। সেই চিরকালের দর্শকের, ইটারন্যাল স্পেকটেটরের, পথ পরিক্রমার ইতিহাস সিনেমার মতোই চাঞ্চল্যকর, গতিশীল।

১৮৯৫ সাল। দর্শক দেখল ছবি নড়ে। দর্শক দেখল ছবির মানুষ ওঠে, বসে, হাঁটে, ছোটে। তারই সঙ্গে ছবির পর্দায় আকাশের মেঘকেও ছুটতে দেখল দর্শক। আকাশের মেঘ, জলের স্রোত, ডাঙার গাড়ি। রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, ফিটন গাড়ি। সবই ছুটছে। দর্শক অবাক। দর্শক স্তম্ভিত।

এতদিন দর্শক দেখে এসেছে ছবি অনড়। কাগজে আটকানো, দেয়ালে লটকানো, ক্যানভাসে বন্দি। কিন্তু আজ দর্শক দেখতে পেল সেই ছবির বন্দিদশা ঘুচেছে, ছবির পর্দার সীমানার মধ্যে তার অবাধ গতি। দর্শক মুগ্ধ। দর্শক বিস্ময়ে অভিভূত।

ছবির মুক্তি ঘটালেন বিজ্ঞানীরা, কিন্তু মুক্ত-ছবির মালিকানা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিলেন দুনিয়াদারির কারবারিরা—ব্যবসায়ীরা। সদ্যমুক্ত ছবির বিপুল সম্ভাবনাকে তাঁরা কাজে লাগালেন, শিল্পীদের ডেকে এনে বসালেন কাজে, যাঁদের দায়িত্ব হল ঘটনার কাঠামোর মধ্যে চলমান ছবিগুলোকে নজরবন্দি করে রাখা। ফলে পর্দায় ছবির গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হল, পারম্পর্য রক্ষা করে একটা পুরো ঘটনার বিন্যাস ঘটল এবং ধীরে ধীরে ঘটনার পর ঘটনা জুড়ে একটা গোটা গল্প ফেঁদে বসলেন ছবির কারবারিরা এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মন আরও জাঁকিয়ে বসল ছবির পর্দায়। প্রথম আবিষ্কারের সাময়িক চমক নয়, ছবির কাহিনি ও ছবির কীর্তি দর্শকদের সত্তাকে পুরোপুরিভাবে দখল করে বসল ধীরে ধীরে।

দর্শক একের পর এক গল্প দেখতে পেল ছবির পর্দায়। পুরো গল্প। এতদিন সে গল্প শুনেছে গল্প-বলিয়ের কাছে, বইয়ের পাতায় পড়েছে, রঙ্গমঞ্চে শুনেছে ও দেখেছে। কিন্তু ছবির দর্শক ছবির পর্দায় এই প্রথম গোটা একটা গল্প দেখার রস আস্বাদন করল। রুদ্ধনিশ্বাসে দর্শক দেখল। দেখল দুঃসাহসিক এক পুরুষ অথবা নারী। পুরুষের হাতে তরোয়াল, হয়তো বা কোমরে রিভলভার। নারীর

চোখে ঠুলি, পরনে ট্রাউজার। যা খুশি তাই করে চলেছে এই পুরুষটি অথবা নারীবেশী ছবিটি, যেখানে খুশি চলে যাচ্ছে। কখনও বেলুনে চেপে চাঁদে চলে যাচ্ছে, কখনও এক লাফে তেতলার ছাদে উঠছে, কখনও বা ধাবমান রেলগাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ছে চলমান মোটরগাড়ির ঘাড়ে, আবার কখনও সমুদ্রের তলদেশে এক নতুন দেশের সন্ধান পাচ্ছে। ছবির পর্দা অসাধ্য সাধন করে চলেছে এই অমানবিক পুরুষ বা ঠুলি পরা মহিলাটি! 'বাহাদুর-কা-খেল' অথবা 'হান্টারওয়ালি'র রহস্য। দর্শক দেখছে, শিহরন জাগছে প্রতি মুহূর্তেই, চেয়ারের হাতল শক্ত করে চেপে ধরছে মাঝে মাঝে; সব শেষে উল্লসিত করতালির মধ্যে প্রেক্ষাগৃহের আলো জ্বলে উঠছে।

. প্রেক্ষাগৃহের চৌকাঠ পেরোল দর্শক। পান-বিড়ি-সিগারেট। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি। রাস্তায় ভিড়, মানুষের মিছিল। শহরে শব্দের শোরগোল।

দর্শক হুমড়ি খেয়ে পড়ল হট্টগোলের হাটে। রূপকথার নেশা উঠে গেল এক মুহূর্তে। একটা ধাক্কায় দর্শক ছবির কল্পলোক থেকে ছিটকে এসে পড়ল শান-বাঁধানো ফুটপাথে। সঙ্গে সঙ্গে চেহারা পালটাল, দর্শকের মনের চেহারা। গোটা মানুষটার রূপ বদলাল। দর্শকের রূপান্তর ঘটল নাগরিকত্বে—যে নাগরিক হাঁটে, চলে, ভাবে—সংসারে দায়িত্ব যার ঘাড়ে, সমাজ-চিন্তার যে অংশীদার, রাষ্ট্রীয় জীবনে যে উপস্থিত।

অর্থাৎ চারিদিকের বাস্তব পরিবেশের চাপে দর্শকের অস্তিত্ব লোপ পেল প্রেক্ষাগৃহের চৌকাঠ ডিঙোতেই, ছবির প্রভাব কেটে গেল দরজা পেরোতেই। অথচ এটাই কি ছবির কারবারিরা চেয়েছিলেন? শুধু এইটুকুর জন্যেই কি ব্যবসায়ীরা টাকা ঢেলেছিলেন? আর বিজ্ঞানের এত বড়ো অবদান কি এইটুকুতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে? নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন ছবির কারবারিরা। নতুন নতুন শিল্পী আমদানি করলেন ছবির ব্যবসায়ীরা। আর ছবির বিজ্ঞানীরা ছবিকে কথা কওয়াতে উঠেপড়ে লাগলেন।

ছবির প্রভাব ছড়িয়ে গেল আরও অনেকখানি। প্রেক্ষাগৃহ ছাড়িয়ে ছড়াল রাস্তায়, ট্রামে, বাসে, বৈঠকখানায়, লাউঞ্জে, চায়ের টেবিলে। নতুন গল্প বাঁধলেন ছবির গল্পকার, নতুন রূপ ও রীতি জন্ম নিল ছবির পর্দায়! 'বাহাদুর-কা-খেল' আর 'হান্টারওয়ালি'র পরিবর্তে দর্শক দেখল এমন কতকগুলো চরিত্রকে যারা হাঁটছে, চলছে, কথা বলছে বেশ কাছের মানুষের মতো, যার কথায় কথায় চাঁদের দেশেও যাচ্ছে না বা এক লাফে তেতলার ছাদে গিয়েও পড়ছে না।

কিন্তু একেবারেই লাফালাফি করছে না এমনও হল না। নায়িকা এবারও লাফাল, কিন্তু যুক্তির বেড়া ডিঙিয়ে পড়ল না। ছবির নায়িকা এবার লাফিয়ে পড়ল পাঁচিল ডিঙিয়ে। কলেজের পাঁচিল, ছোটো পাঁচিল। কলেজ পালিয়ে

কলেজ-তরুণী লাফিয়ে পড়ল কলেজের সীমানার বাইরে। এবং পড়ল তো পড়ল একেবারে নায়কের ঘাড়ে।

নায়ক মজুর। মজুর বলেই কেবল মজুরির কথাই ভাববে এমন নায়ক কিন্তু সে মোটেই নয়। সে যে নায়ক, ছবির নায়ক। মেয়ে-কলেজের পাঁচিলে ঠেসান দিয়ে নায়ক মজুর, ভাবুক মজুর গান গাইছিল তখন। প্রাণমাতানো গান। ঠিক এমনি সময়ে ঝুপ করে ঘাড়ে পড়ল প্রথমে একজোড়া হাই হিল জুতো আর তারপর নায়িকা। তারপর? তারপর এক দুরন্ত রোমান্স। এক রোমাঞ্চকর রোমান্স। সেই রোমান্সের দরিয়ায় হাবুডুবু খেল নায়ক-নায়িকা, আর সেই রোমান্স-লাঞ্ছিত জলের ঝাপটা খেল দর্শক। মন ভরে উঠল দর্শকের।

রাস্তায় ভিড়ে এসে দাঁড়াল দর্শক। রোমান্টিক আবেশে তখনও সে আচ্ছন্ন। কোথায় মনের কোন নিভৃত কোণে কী দুরূহ ইচ্ছা, এক না-মেটানো ক্ষুধা যেন তাকে পেয়ে বসল। বাস্তবের পরিবেশে নিজেকে মিশিয়ে দিতে, চলমান পৃথিবীর বুকে গা ভাসিয়ে দিতে সে আজ নারাজ। নাই বা জানল সে গাইতে, কলেজের মেয়েকে কাঁধে চাপাতে নাই বা পারল সে। তবু—।

দর্শকের চোখে ঘুম নেই। আচ্ছন্নতায় মুহ্যমান দর্শক। ছবির প্রভাব ছড়িয়ে রইল তার সমস্ত অস্তিত্বে। এবং শেষ পর্যন্ত দর্শক আবার ফিরে এল তার নিজেতে, তার নাগরিক সত্তায় এক প্রচণ্ড ধমক খেয়ে। অফিসের সাহেবের ধমক—হিসাবে গোলমাল হয়েছে। অথবা গিন্নির মুখঝামটা—গোয়ালার দু'মাসের দাম বাকি পড়েছে। অথবা হেডমাস্টারের শাসানি।

সব ঝুটা হ্যায়! দর্শক বুঝল, সবটাই বানানো, সবটাই কল্পিত। কেবল বাস্তবের একটা খোলস রয়েছে মাত্র। চোখ ফিরিয়ে রইল দর্শক। কানে তুলো এঁটে রইল।

অর্থাৎ ছবির সম্পদ বেড়েছে এবং তারই সঙ্গে দর্শকও সম্পদশালী হয়েছে। 'বাহাদুর-কা-খেল' ও 'হান্টারওয়ালি'কে নাকচ করে দিয়ে ছবির কারবারিরা যখন নতুন কিছু উপস্থাপিত করছেন ছবির পর্দায়, দর্শক তাই নিয়ে বেশ কিছুদিন মাতামাতি করছে, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দর্শকের চাহিদা বেড়ে গেল আরও অনেকখানি এবং সেই চাহিদার চাপ এসে পড়ল ছবির কারবারিদের ওপরে। তার ওপর ভেতরে ভেতরেও নতুন সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করলে শিল্পীরা। আরও নতুন, আরও রক্ত-মাংস-জাত, আরও বাস্তব।

নতুন নতুন আরও অনেক কিছু জন্ম নিল ছবির পর্দায়। নতুন কাহিনি, নতুন আঙ্গিক, সমাজের নতুন নতুন সমস্যা, নতনতর শিল্পের সার্থক প্রয়োগ।

প্রভাব বিস্তৃত হল আরও। সমাজের কর্তারা ছবিকে স্বীকার করে নিলেন। সমাজশিক্ষার মূল্যবান বাহন হিসেবে পরিগণিত হল ছবির শিল্প।

ছবির দর্শক নমস্কার জানাল সে যুগের শিল্পনায়কদের, প্রেক্ষাগৃহের বাইরে তাঁদের নাম ছড়িয়ে দিল চারিদিকে। তারপর, আবার একদিন দর্শক উশখুশ করে উঠল, একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় খানিকটা হাঁপিয়ে ওঠার মতো অবস্থা হল দর্শকের। 'বড়ুয়া কলার' তখন রীতিমতো 'বাজারে' হয়ে পড়েছে, মেয়েদের গায়ে তখন উঠেছে হিট-পিকচারি ব্লাউজ আর শাড়ি।

বড়ুয়া কলার-এর চটক আর হিট-পিকচারি ব্লাউজ ও শাড়ির মোহ ছাপিয়ে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল দর্শকের উশখুশুনি। কেমন যেন পানসে হয়ে পড়ছে ছবির রাজ্য, যেন প্রাণহীন। নতুন কিছু চাই—নতুন, বাস্তব, জীবন্ত।

দেশে তখন দারুণ দুর্যোগ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর পঞ্চাশের মন্বন্তর একটা ওলটপালট এনে দিল জাতীয় জীবনে, তছনছ করে দিল পারিপার্শ্বিককে, উলঙ্গ বাতাসের মুখোমুখি টেনে নিয়ে এল নাগরিক মানুষকে। বঞ্চনা, জ্বালা আর ক্রোধ—সমস্ত মিলিয়ে সবাই যেন কেমন হয়ে উঠল। অতি বড়ো স্বপ্নবিলাসীরও স্বপ্ন সেদিন ভেঙে গেল কঠিন বাস্তবের হুংকারে। সাদা চোখে সে দিন একে অপরকে দেখল এবং পারিপার্শ্বিককে বুঝল!

সে দিনের সেই বাস্তবের মহাশ্মশানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাস্তবের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলতে পারলেন না বুদ্ধির কারবারিরা, শিল্পী-সাহিত্যিকেরা। এবং শেষ পর্যন্ত সেই ছোঁয়াচ এসে হানা দিল রোমান্টিক আবেশে আচ্ছন্ন সে দিনের সেই ছবির রাজ্যেও। নতুন ছবি তৈরি হল, নতুন ইতিহাস।

ছবির নায়ক বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত ঘরের বুদ্ধি-খাটিয়ে, স্বল্প-রোজগারে যুবক। ছবির নায়ক পায়ে হেঁটে পথ চলেছিল সে দিন, ট্রামে চেপেছিল, ট্রাম থেকে দেখতে পেয়েছিল শহরের রাস্তার জীবন্ত কঙ্কালের মিছিল আর দেখেছিল চালের দোকানের সামনে অপেক্ষমাণ মানুষের ভিড়। নায়িকা কারখানার মালিকের মেয়ে—সভ্য, স্নিগ্ধ, সপ্রতিভ। কাল তেরোশো পঞ্চাশ। ছবির পরিবেশের সঙ্গে মিশে গেল দর্শকের নাগরিক সত্তা, ছবির চরিত্রের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে গেল দর্শক। শশকের মতো কান খাড়া করে দর্শক শুনল ছবির প্রতিটি কথা, চোখ বড়ো বড়ো করে দেখল সব। দেখল কারখানার মজুরেরা জমায়েত হয়েছে সভায়—তাদের দাবি তারা মেটাতে বদ্ধপরিকর। বক্তা বুদ্ধিজীবী নায়ক—বলিষ্ঠ, দৃপ্ত। দর্শক দেখল, নায়িকাকে নজরবন্দি করে রেখেছেন কারখানার মালিক—নায়িকার বাবা। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, ঘড়িটা অবিশ্রান্ত টিক টিক করেই চলেছে। নায়িকা উশখুশ করছে, ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে বারবার। সত্য ভঙ্গ হতে চলেছে নায়িকার। দর্শক উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠছে। প্রচণ্ড ক্লাইম্যাক্স। তারপর একসময়ে, দর্শকের মনে আনন্দের ঢেউ জাগিয়ে আর পরিবারের মুখ হাসিয়ে নায়িকা নেমে এল (অথবা উঠে এল) নায়কের কাছে। নায়কের পাশাপাশি

দর্শকের হৃদয় জয় করে নিল সেই ছবি। মস্ত তোলপাড় পড়ে গেল সমস্ত দেশে। ছবির ইতিহাসে এক দুঃসাহসিক ব্যতিক্রম হিসেবে অভিনন্দন জানাল দেশের মানুষ—নাগরিক মানুষ।

এমনি সময় দর্শকের কানে এল নতুন একটা খবর। ছেঁকে বাছাই-করা ছবির সম্মেলন ঘটানো হচ্ছে শহরের প্রেক্ষাগৃহে—যে ছবির ঠিকানাও দর্শক কোনও দিন পায়নি সেইসব ছবি, যে শিল্পীর নামও কোনও দিন শোনেনি।

দর্শক ছুটল প্রেক্ষাগৃহে। নিত্যনতুন ছবি দেখল দর্শক—নানা জাতের, নানা ঢঙের। অবাক বিস্ময়ে দেখল দর্শক। গুপ্তধনের সন্ধান পেল।

ছবির পর্দায় দেখল জীবনের দৈনন্দিনতা। দেখল দৈনন্দিনতার মাধুর্য, দৈনন্দিনতার কাব্য, দৈনন্দিনতার নাটকীয়তা। দর্শক দেখল সেইসব শিল্পীর ছবি যাঁরা অতি সাধারণ, মানুষের পারিপার্শ্বিকের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলাই যাঁদের উদ্দেশ্য এবং যাঁরা জীবনের প্রতি অচঞ্চল বিশ্বাস নিয়ে ঘোষণা করার ক্ষমতা রাখেন:

> We make things spectacular not by their exceptional qualities, but by their natural qualities.

দর্শক স্তম্ভিত, অভিভূত। এবং দর্শকের মনে মন মিশিয়ে ছবির শিল্পীও স্তম্ভিত, অভিভূত। দর্শক চঞ্চল হয়ে উঠল। শিল্পী দিশেহারা।

ঠিক এমনি সময়ে পর্দায় হঠাৎ অবিশ্বাস্যভাবে আবির্ভাব এক নবতম বিস্ময়ের। অনন্যসাধারণ, অনির্বচনীয়। ছবির পর্দায় এক মহৎ কাব্যের রস আস্বাদন করল দর্শক, প্রত্যক্ষ করল এক বিরাট প্রতিভা। জীবনের মাধুর্য, জীবনের মহত্ত্ব জীবনের কাব্য; সত্তার আশ্চর্য সুন্দর স্নিগ্ধতা ছবির পর্দায় জীবন্ত হয়ে ধরা দিল দর্শকের চোখে। কাব্য বৃষ্টির জলে দুর্গার চুল ভিজিয়ে নেওয়াতে, কাব্য কাশবন পেরিয়ে রেলগাড়ির চলাতে, কাব্য শান্ত পুকুরের ছোটো পোকার অকারণ চঞ্চলতায়।

দর্শক মুগ্ধ। দর্শক বিস্মিত। সমস্ত দেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আর বিদেশ অভিনন্দন জানাল।

ছবির রাজ্যে বিপ্লব ঘটল। বিপ্লবে সাড়া দিল আরও অনেকে। আর দর্শক মুখিয়ে রইল সামনের দিকে। ভবিষ্যতের দিকে।

দর্শক আজও বেড়েই চলেছে, এগিয়ে চলেছে দর্শক সামনের দিকে। ছবির মতো। ছবিরই সঙ্গে সঙ্গে।